প্রসঙ্গ : অনুপ্রবেশ

অমলেন্দু দে

PRASANGA : ANUPRABESH

[***Essays on Indo-Bangladesh Demographic scenario and influx from Bangladesh***]

প্রথম প্রকাশ

৩০ জুন, ১৯৯৩ ।। ১৫ আষাঢ়, ১৪০১

সংহতি-চেতনা গ্রন্থমালা—দুই

প্রকাশিকা

ড: অতসী কার্ফা

বর্ণ পরিচয়

২১৪/১, বামাচরণ রায় রোড

কলকাতা - ৭০০ ০৩৪

পরিবেষক

চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর

শুভংকর বসু

জে. জি. প্রিন্টার্স

১৮৯, অরবিন্দ সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদের ব্লক নির্মাণে ও মুদ্রণে

দি রেডিয়েন্ট প্রসেস

প্রচ্ছদ : সজল রায়

[১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা অঞ্চলে সমাজবিরোধীরা রশীদ নাইয়াকে এবং ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে বিশ্বনাথ তেওয়ারীকে হত্যা করে।]

বিষয়-সূচি

পরিশিষ্ট

বর্ণ পরিচয় প্রকাশিত গ্রন্থ-সম্ভার

ডঃ কুমুদকুমার ভট্টাচার্য রচিত

১. **শরৎচন্দ্র ও বাংলার কৃষক** [দ্বিতীয় মুদ্রণ]

২. **উনিশ শতকের নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও কবি গোবিন্দ দাস**
[কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিফিথ পুরস্কার-প্রাপ্ত গ্রন্থ। রায়ত-কৃষকের ওপরে ভূস্বামী শ্রেণীর অত্যাচার সম্পর্কে ভাওয়ালের স্বভাব কবি গোবিন্দ দাসের রচনা 'মগের মুলুক' কাব্য ও কবি-জীবন সম্পর্কে আলোচনা]

৩. **রামমোহন-ডিরোজিও : মূল্যায়ন** [দ্বিতীয় সংস্করণ]

৪. **আধুনিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা**

৫. **রাজা রামমোহন : বঙ্গদেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি**
[দ্বিতীয় মুদ্রণ]

৬. **পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর** [যন্ত্রস্থ]

* *

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

৭. **মধুর স্বপ্ন**

* *

কুমুদকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত

৮. **আখ্যান মঞ্জরী**—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৯. **বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাস**—শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন

* *

বিমান বসুর ভূমিকা ও কুমুদকুমার ভট্টাচার্যের সম্পাদনা

১০. **হিন্দু-পাদ-পাদশাহী**
[লেখকবৃন্দ : সৈয়দ নুরুল হাসান, রবীন্দ্র গুপ্ত, সুদিন চট্টোপাধ্যায়, পল্লব সেনগুপ্ত, গৌতম রায়, অঙ্গনা ভট্টাচার্য ও কুমুদকুমার ভট্টাচার্য]

পরিবেশক। চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ

ভূমিকা

গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন সেমিনারে ও পত্র-পত্রিকার জন্য বাংলাদেশ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। বহুকাল আগে বাঙালী জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে যেসব গবেষণা-গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তা প্রধানত ঔপনিবেশিক আমলের সময়সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি আমার ভাবনা স্বাধীনোত্তর যুগের প্রতি প্রসারিত হয়েছে। আর এই প্রসঙ্গেই ভারতের ও বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ও বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে লিখতে আগ্রহ বোধ করি। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ' গ্রন্থে এবং ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে পঠিত 'The Muslims as a Distinct Factor in Assam Politics (1826-1947)' প্রবন্ধে (এই নিবন্ধটি Bengal Past and Present, July-December, 1977 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়) রিপোর্টসমূহ এবং অন্যান্য মূল্যবান তথ্য অবলম্বন করে যেভাবে বাংলা ও অসম রাজ্যের জীবনধারা বিশ্লেষণ করেছিলাম, তারই সূত্র ধরে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালের সমাজচিত্রটি তুলে ধরার প্রয়াস করি। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকেই এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নিয়ে লিখতে শুরু করি। সুতরাং বর্তমান প্রবন্ধগুলিতে ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়।

এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটি 'পরিচয়' (মে-জুলাই, ১৯৯২) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখন প্রবন্ধের শিরোনামা ছিল 'বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনবিন্যাস মানচিত্রে পরিবর্তন'। পরে যখন পরিচয়-এর এই প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়, তখন তার শিরোনামা ছিল 'বাংলাদেশের জনবিন্যাস ও সংখ্যালঘু সমস্যা' (কলিকাতা, আগস্ট, ১৯৯২)। কিন্তু এই গ্রন্থে প্রবন্ধের শিরোনামা পরিবর্তন করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারি সমিতি প্রকাশিত 'সমন্বয়', শারদসংখ্যা, ১৯৯৩, নবম বর্ষ সংখ্যায় বের হয়। প্রবন্ধের মূল অংশ সবটা মুদ্রিত হলেও, সূত্র-নির্দেশ অংশের কিছুটা প্রকাশিত হয়। এখানে সূত্র-নির্দেশের সমগ্র অংশই প্রকাশ করা হলো। তৃতীয় প্রবন্ধটি 'সংবাদ প্রতিদিন' (কলিকাতা, ৪ জুলাই, ১৯৯৩) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখন এই প্রবন্ধের শিরোনামা ছিল 'পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগোষ্ঠী ও বাংলাদেশ সরকার'। এখানে প্রবন্ধের শিরোনামা

মিথ্যাই তাদের মূলধন। সাধারণ মানুষকে বিপথে চালিত করার উদ্দেশ্যে তারা যেমন বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে ইতিহাসের বিরুদ্ধে অভিযান করেছে, তেমনি তারা অনুপ্রবেশ-সমস্যার ওপরে সাম্প্রদায়িক রং আরোপ করে জনমনে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ঘটাতে চাইছে। পক্ষান্তরে বামপন্থী দলগুলি অনুপ্রবেশ-সমস্যার সত্য উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হলেও তাঁদের বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতার জন্য বি. জে. পি.-র মিথ্যা প্রচারকে প্রতিরোধ করা যায়নি। সম্ভবত তাঁরা ভাবছেন, অনুপ্রবেশ-সমস্যার সত্য-চিত্র উদ্ঘাটিত হলে এদেশে হিন্দুমৌলবাদীরা শক্তিশালী হবে। সত্যকে অবলম্বন করে অনুপ্রবেশ-সমস্যার সমাধানের জন্য যে বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়তার প্রয়োজন, বামপন্থী দলগুলির বক্তব্যে তার একান্ত অভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের মধ্যে অনেকে সত্যকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন, সত্যের মুখোমুখি হতে চাইছেন না। অথচ রোগ চাপা দিয়ে রোগীকে সুস্থ করা যায় না। ঝাড়ফুঁক করে রোগ সারানো যায় না, রোগীকে বাঁচানো যায় না। সেজন্য প্রয়োজন সত্যপ্রীতি, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ও রোগের কারণসমূহ নির্ণয়। অনুরূপ অনুপ্রবেশ-সমস্যায় আক্রান্ত আমাদের দেশটিকে রক্ষা করতে হলে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অনুপ্রবেশ-সমস্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

দুই বাংলার কিছু বুদ্ধিজীবী ও কয়েকটি সংবাদপত্র তথ্যের ভিত্তিতে অনুপ্রবেশ-সমস্যার সঠিক বিশ্লেষণ করে দুই দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আন্দোলনকে শক্তিশালী করছেন। অথচ আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সংগ্রামে যে সর্ববৃহৎ বামপন্থী দল প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে, অনুপ্রবেশ-সমস্যার রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের সীমাবদ্ধতা আমাদের বিস্মিত করেছে। অবশ্য এর আগেও মৌলবাদী দলগুলি ও তাঁদের চিন্তাধারার সমর্থকদের মুখোস ছিঁড়ে ফেলতে তাঁদের দ্বিধা ও দোদুল্যমানতার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাক।

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরের বাংলাভাষার পাঠক্রম ছিল দেশ, জাতি, ধর্ম ও সমাজের সংগে সম্পর্কশূন্য। কিন্তু কয়েকজন সমাজ-সচেতন বুদ্ধিজীবীর ঐকান্তিক প্রয়াসে ১৯৮৪ সালে যে-নতুন উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা পাঠক্রম তৈরি হলো, তা সর্বাংশে সর্বোত্তম না হলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত প্রচলিত বাংলা পাঠক্রমের তুলনায় নতুন পাঠক্রম ছিল ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস ও সমাজের সংগে ছাত্রদের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের সর্বপ্রথম সার্থক প্রয়াস।

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ মাধ্যমিক বাংলাভাষার পাঠক্রম 'বাংলা সঞ্চয়ন' (গদ্য) প্রকাশ করতে গিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তৎকালীন সভাপতি ড: দেবশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখেছেন, "সংকলনটির রচনাগুলি বিভিন্ন সময়ের ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে এবং এই বিবর্তনের ধারা ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরে সাহিত্য ও ভাষার অবিচ্ছিন্ন প্রবহমানতা, ভাবধারার ক্রমিক বিবর্তন এবং রচনাশৈলীর বিচিত্র স্বাদ ও সৌন্দর্য।" অর্থাৎ সংকলন-গ্রন্থ প্রণয়নকালে সমাজমুখীন দৃষ্টিভঙ্গি না থাকায় এই গ্রন্থটি হয়ে উঠেছিল কেবলমাত্র ভাষাশিক্ষার গ্রন্থ, সমাজবিবিক্ত সাহিত্য-গ্রন্থ। তারফলে ছাত্ররা সংকলন গ্রন্থে 'রচনাশৈলীর বিচিত্র স্বাদ ও সৌন্দর্য" অনুভব করতে পারলেও সামাজিক দায়িত্ব পালনের শিক্ষা পায়নি। তারা পরীক্ষায় পাশ করেছে, কিন্তু দেশ, জাতি ও সমাজ সম্পর্কে তারা রয়ে গেছে অজ্ঞ।

কিন্তু ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত বাংলাভাষার নতুন পাঠক্রম ছিল সমাজকেন্দ্রিক, তবে তা সাহিত্য-বর্জিত ছিল না। দেশ ও সমাজ-বিষয়ক বাংলা রচনার সঙ্গে সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধও নতুন সংকলন-গ্রন্থে ছিল। অর্থাৎ ছাত্রদের সম্পূর্ণ মানুষ রূপে গড়ে তোলাই ছিল সংকলন-প্রণেতাদের লক্ষ্য। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তদানীন্তন সভাপতি শ্রীমতী অনিলা দেবী নতুন বাংলা সংকলন-গ্রন্থের ভূমিকায় সঠিক ভাবে মন্তব্য করেছেন, "এই সংকলনে পঠিতব্য প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও নাটক, শিক্ষার্থীদের অনুভূতি ও চিন্তাচেতনায় যাতে জাতীয় ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সমাজবিকাশের ধারা, শিক্ষণীয় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে অবিভাজ্যতার ধারণা, সর্বোপরি বিবর্তনশীল ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মানবীয় আদর্শবোধ ও বিচারশীল মূল্যবোধ গড়ে ওঠে, এই দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা হয়েছে।"

পূর্বোক্ত সংকলন-গ্রন্থের রচনাগুলি নির্বাচনে বাংলা বোর্ড অব স্টাডিজের সদস্যরা সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। নির্বাচিত রচনাগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সর্বজনশ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহ্মদের 'সাম্প্রদায়িকতার বিষম পরিণাম' প্রবন্ধটি। তাঁর প্রবন্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব ও বিকাশ, কেরলের মোপলা কৃষকদের বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রূপে অভিহিত করার প্রয়াস, সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতি কংগ্রেসের আপসকামী মনোভাব ইত্যাদি কারণের জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্বলতা প্রদর্শিত হয়েছিল। ধর্মের ভিত্তিতে খণ্ডিত ভারতে এই রচনাটির বক্তব্য-বিষয় ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বোর্ড অব স্টাডিজের সভায় প্রবন্ধটির প্রস্তাবক ছিলেন

ড: কুমুদকুমার ভট্টাচার্য। সদস্যরা প্রবন্ধটি নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে প্রবন্ধটি নির্বাচিত হয়। তাছাড়া তাঁর প্রস্তাবক্রমে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী একটি ছোট গল্প (সমরেশ বসু: আদাব) এবং একটি কবিতা (জীবনানন্দ দাশ: ১৯৪৬-৪৭) বাংলা সংকলন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ছাত্রদের মনে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মানসিকতা গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছিল।

কিন্তু সংকলন-গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায় কংগ্রেস (আই) উত্তেজিত হয় এবং নেতাদের নির্দেশে ছাত্র পরিষদ 'বাংলা সংকলন' (গদ্য) গ্রন্থ থেকে মুজফ্ফর আহ্মদের 'সাম্প্রদায়িকতার বিষম পরিণাম' প্রবন্ধটি বাতিল করার দাবিতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কার্যালয়ে (কৈলাস বসু স্ট্রিট) ফ্যাসিস্ট কায়দায় হামলা করে, চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করে। সর্বজনশ্রদ্ধেয় আত্মত্যাগী মুজফ্ফর আহ্মদের অপরাধ ছিল, উক্ত প্রবন্ধ-রচনায় তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামের দুর্বলতা ও মৌলবাদ উদ্ভবের কারণগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি উক্ত প্রবন্ধে খিলাফৎ কমিটি, হিন্দু মহাসভা, জমিয়ৎ-ই-উলেমা, শুদ্ধি সভা, তবলীগ, হিন্দু সংগঠন, তনজীম, শিখ লীগ ও মুসলিম লীগ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দল ও সংগঠন-সহ মদনমোহন মালব্য, লালা লাজপত রাই, ডা: মুঞ্জে, ডা: সাইফুদ্দিন কিচলু প্রমুখ 'বহুরূপী' নেতাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে লিখেছেন, "সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানগুলির বিষময় ফল এই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আজকাল বহুসংখ্যক লোক সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের কথা চিন্তা না করে কেবলমাত্র একটা বিশিষ্ট গন্ডির বিষয়ই ভাবছে। হিন্দু ভাবছে কী করে মুসলমানকে জব্দ করা যাবে, আর মুসলমান ভাবছে ঠিক তার উল্টো। এই করে ভারতের জাতীয় জীবন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে বসেছে।" সুতরাং তিনি সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, তার ফলে "মুসলিমরা তনজীম করবে হিন্দুদের মাথা ভাঙার উদ্দেশ্য নিয়ে, আর হিন্দুরা সংগঠন করবে মুসলমানদের মাথা ভাঙার জন্য।"

মুজফ্ফর আহ্মদ উক্ত প্রবন্ধটি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেছেন এবং প্রবন্ধটি ১৯২৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর 'গণবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ শ্রী আহ্মদ ঐ সময়কার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি উক্ত প্রবন্ধে অতিরঞ্জন করেননি এবং কোথাও ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাননি। ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখার জন্য তিনি ধর্মীয় সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি ও উন্মত্ততা সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃত্বের নরম মনোভাব, আপসকামী নীতি ও দোদুল্যমানতা এবং গান্ধীজীর

ধর্মচর্চাকে সমালোচনা করে সংযত ভাষায় লিখেছেন, "প্রথম কথা, কংগ্রেসের সহিত কখনো দেশের সর্বসাধারণের জীবনের যোগ সাধিত হয়নি। ভদ্র ও অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাই কংগ্রেসের সর্বেসর্বা, জনসাধারণ তার কেউ নয়। দ্বিতীয়ত, মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসকে ধর্মচর্চার ক্ষেত্র করে তুলেছিলেন। এই অসম জিনিসের একত্র সমাবেশ করার চেষ্টার অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল এখন দেশে ফলেছে।" এই সমালোচনা ঐতিহাসিক সত্য। কংগ্রেস-নেতাদের মধ্যে অনেকে একই সঙ্গে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার সদস্য ছিলেন। হিন্দুত্ববাদী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। সর্বোপরি, গান্ধীজী মনেপ্রাণে অসাম্প্রদায়িক হলেও তাঁর হিন্দুধর্ম প্রীতির জন্য মুসলিম মৌলবাদীরা কংগ্রেসকে হিন্দুদের রাজনৈতিক দল বলে বিভ্রান্তি ছড়ানোর সুযোগ পেয়েছিল।

গান্ধীজীর ধর্মাচরণ সম্পর্কে মুজফ্ফর আহ্মদের উক্তি যে-অনৈতিহাসিক নয়, তা গান্ধীজীর উক্তিতেই সমর্থন পাওয়া যায়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১২ অক্টোবর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় সোচ্চারে বলেছেন, "আমি নিজেকে একজন সনাতন হিন্দু বলে ঘোষণা করছি। কারণ এক, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ এবং হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বলে পরিচিত সব কিছুতেই আমি বিশ্বাস করি; সুতরাং আমি অবতার ও পুনর্জন্মেও গভীর বিশ্বাস রাখি। দুই, বর্ণাশ্রম ধর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সেই বর্ণাশ্রম বর্তমান সময়ের স্থূল অর্থে নয়, এটি এক অর্থে আমার মতে সম্পূর্ণ বেদভিত্তিক। তিন, গোরক্ষা সম্বন্ধেও আমার বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ়। এসম্বন্ধেও সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণার তুলনায় আমার চিন্তা অনেক ব্যাপক। চার, আমি মূর্তিপূজায় গভীর ভাবে বিশ্বাস করি।" পরের বছরে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় তিনি পুনরুক্তি করেছেন (২৩.২.১৯২২), "আমি আমার নিজের মুক্তিকে অন্য সব কিছুর চেয়েও বড় করে দেখি। তাই আমি সর্বপ্রথমে হিন্দু, তারপরে দেশপ্রেমিক।" একালের বি. জে. পি.-র নেতারাও এই জাতীয় উক্তি করতে সাহসী হননি।

ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরাও মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে গান্ধীজীর ধর্মপ্রীতি, দুর্বলতা, স্ববিরোধিতা ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। তাসত্ত্বেও শিক্ষার্থীদের কাছে সাম্প্রদায়িকতার যথার্থ ইতিহাস উত্থাপনের বিরুদ্ধে ছাত্রপরিষদের কুণ্ঠার কারণ কী? ইতিহাসের কণ্ঠরুদ্ধ করার জন্য তাদের হিংস্র প্রয়াস কেন? ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। এসময়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভের জন্য আর. এস. এস.-এর সঙ্গে গোপন আঁতাত

করেছিলেন। মৌলবাদীদের তোয়াজ করে এই আঁতাতকে অটুট রাখার জন্যই ছাত্র পরিষদ মুজফ্ফর আহ্মদের উক্ত প্রবন্ধ বাতিলের দাবিতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কার্যালয় আক্রমণ করে মৌলবাদীদের সন্তুষ্ট করেছিল।

মুজফ্ফর আহ্মদের উক্ত প্রবন্ধ পাঠের মধ্য দিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের তরুণেরা সাম্প্রদায়িকতার বিষম পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হয়ে মৌলবাদ-বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হতো এবং পশ্চিমবাংলার সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সংগ্রাম শক্তিশালী হতো। কিন্তু কি কারণে জানি না, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কর্তৃপক্ষ ১৯৮৭ সালে বাংলা গদ্য সংকলন গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণকালে মুজফ্ফর আহ্মদের 'সাম্প্রদায়িকতার বিষম পরিণাম' প্রবন্ধটি বর্জন করে বর্তমান কালের পক্ষে একটি গুরুত্বহীন নতুন প্রবন্ধ 'ভবিষ্য ভারত' সংযোজন করেছেন এবং সংস্কারসাধন সত্ত্বেও মুদ্রিত গ্রন্থটিকে দ্বিতীয় সংস্করণ না বলে 'পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৭' বলেছেন। তারপরেও সংকলন-গ্রন্থটি দুবার (১৯৮৮ খ্রি: ও ১৯৯২ খ্রি:) পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কর্তৃপক্ষ সাম্প্রদায়িক শক্তির পৃষ্ঠপোষকদের কাছে কেন আত্মসমর্পণ করে মুজফ্ফর আহ্মদের 'সাম্প্রদায়িকতার বিষম পরিণাম' প্রবন্ধটি বাতিল করলেন, তার কোনও ব্যাখ্যা দেননি। প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণের সম্মুখে তাঁদের পশ্চাদপসরণের ফলে উচ্চ মাধ্যমিকের বাংলা সংকলন (গদ্য) গ্রন্থে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী কোনও প্রবন্ধ থাকল না এবং আজও তাঁরা মৌলবাদ-বিরোধী কোনও প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করেননি। অথচ পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু ও তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী শিক্ষাদানের কথা বলেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ড: কুমুদকুমার ভট্টাচার্য যে-খসড়া পাঠক্রমের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন এবং যা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের 'সংসদ পরিচিতি' পত্রিকায় (৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, নভেম্বর ও ডিসেম্বর, ১৯৭৯) প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে আরও তিনটি সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী প্রবন্ধের নাম (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: হিন্দু মুসলমান; এস. ওয়াজেদ আলি: হিন্দু-মুসলমানের মিলন, কাজী আবদুল ওদুদ: মিলনের কথা) প্রস্তাবিত হয়েছিল। সংসদ-কর্তৃপক্ষ এই তিনটি প্রবন্ধের মধ্যে যে-কোনও একটি প্রবন্ধ নির্বাচিত করলে পশ্চিমবাংলায় সাম্প্রদায়িক শক্তিকে দুর্বল করা সম্ভব হতো।

কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের সবলতা-দুর্বলতা ও সাম্প্রদায়িক মিত্রতা সম্পর্কে ছাত্রদের সচেতন করার জন্য মুজফ্ফর আহ্মদের উক্ত প্রবন্ধটি সংকলন গ্রন্থে

রাখা প্রয়োজন ছিল। সাম্প্রদায়িক বিভাজনে মৌলবাদীদের দুরভিসন্ধিপূর্ণ প্রয়াস ও সাম্প্রদায়িক শক্তির ধর্মোন্মাদনা সৃষ্টির চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য উভয় সম্প্রদায়ের তরুণ ও যুবকদের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করার কাজে উক্ত বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধটি সহায়ক হতো।

সর্বজনমান্য কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর উক্ত প্রবন্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের সফলতার জন্য তার দুর্বলতার সত্যনিষ্ঠ চিত্র এঁকেছিলেন। অনুরূপ ভাবে পশ্চিমবাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু জনসাধারণের কাছে সত্য গোপন না করে অনুপ্রবেশ-সমস্যার যথার্থ চিত্র তুলে ধরেছেন এবং 'গণশক্তি' পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক ও বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় শ্রী শৈলেন দাশগুপ্ত অনুপ্রবেশ ঠেকানোর আহ্বান জানিয়ে মানব মুখার্জী রচিত অনুপ্রবেশ বিষয়ক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "সাম্প্রতিক সময়ের রাজনীতিতে 'অনুপ্রবেশ' একটি নজর কাড়া শব্দ। বিশেষত হিন্দু মৌলবাদের অন্যতম রাজনৈতিক শক্তি ভারতীয় জনতা পার্টি এব্যাপারে যে বিকৃত প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে তাতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা আরও জরুরী হয়ে পড়েছে।...মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা ছাড়া এপ্রসঙ্গের আলোচনা অর্থহীন হয়ে পড়ে।" সেকারণে শ্রী মানব মুখার্জী তাঁর গ্রন্থে অনুপ্রবেশ-সমস্যা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, "এই বই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার একটি সামান্য প্রচেষ্টা।" ড: অমলেন্দু দে-ও শ্রী মুখার্জীর মতো অনুপ্রবেশ সমস্যার উদ্ভব ও কারণ বিশ্লেষণ করে সত্য সন্ধানের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শ্রী মুখার্জী অনুপ্রবেশ-সমস্যা সম্পর্কে ড: দে-র ভিন্ন মত লক্ষ্য করে ধৈর্য হারিয়ে অযৌক্তিক মন্তব্য করেছেন, অধ্যাপক দে "এপ্রশ্নে ধ্যানেশ-নারায়ণ চক্রবর্তী বা তপন সিকদারদের অনেক কাছাকাছি অবস্থান করছেন।"

অথচ উভয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদীদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হলেন ড: দে। হিন্দু মৌলবাদীরা তাঁকে কদর্যভাষায় আক্রমণ করেছেন। একটি পুস্তিকায় ('বুদ্ধিজীবী সমীপেষু') তাঁকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বলা হয়েছে, "তাঁর স্ত্রী মুসলমান এবং মার্কসবাদী, অতএব ডবল প্রগতি। তবু তিনি নিজের মুসলিম নাম পাল্টাতে চাননি। অনেক সংঘর্ষের পরে পাল্টেছেন। তাঁর কবরের জন্য জমি কিনে রাখা হয়েছে। এঁরা নাকি ধর্ম মানেন না। অধ্যাপক নিতান্তই পত্নীগত প্রাণ। তাই 'নতুন গতি' ও 'মিযান' পত্রিকায় হিন্দুর শ্রাদ্ধ করেন।"

অন্যদিকে মুসলিম মৌলবাদীরাও সাম্প্রদায়িক শক্তিকে আক্রমণের জন্য

ড: দে-র ওপরে ক্ষিপ্ত। পশ্চিমবাংলার মুসলিম মৌলবাদীদের মুখপত্র 'সাপ্তাহিক কলম' পত্রিকায় ড: দে-কে তীব্র আক্রমণ করে লেখা হয়েছে (১৭.১০.৯৩), "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদা 'সেকুলার' বলে প্রচারিত, বর্তমানে বি.জে.পি. মানসিকতাসম্পন্ন ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীঅমলেন্দু দে⋯তাঁর একটি সাম্প্রতিক গ্রন্থে ওই 'সাজানো সংগঠনের কথা' কোট করেছেন।"

বাংলাদেশের মুসলিম মৌলবাদীদের মুখপত্র 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় 'কলম' পত্রিকার নিবন্ধটি পুনঃপ্রকাশ করে (১৪ কার্তিক, ১৪০০ বঙ্গাব্দ) ড: অমলেন্দু দে-কে হিন্দু মৌলবাদের সমর্থক রূপে চিহ্নিত করেছেন।

তাসত্ত্বেও মৌলবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অক্লান্ত যোদ্ধা ড: দে অনুপ্রবেশ-প্রশ্নে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের 'কাছাকাছি অবস্থান করছেন' বলে মন্তব্য করে শ্রী মানব মুখার্জী কোন্ শিবিরকে দুর্বল করছেন, তা ভেবে দেখার জন্য তাঁকে বিনীত অনুরোধ করছি।

আমরাও অনুপ্রবেশ-সমস্যা সম্পর্কে আরও আলোচনার জন্য শ্রী শৈলেন দাশগুপ্ত-নির্দেশিত পথে অগ্রসর হয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা প্রবীণ অধ্যাপক ড: অমলেন্দু দে-র অনুপ্রবেশ বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ-সহ শ্রী জ্যোতি বসুর নিবন্ধ এবং বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের রচিত তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থভুক্ত করে প্রকাশ করছি। এই গ্রন্থে প্রকাশিত অনুপ্রবেশ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় ড: দে-র অভিমত যদি বামপন্থী মহলে বিতর্ক সৃষ্টি করে, তাহলে সুস্থ ও সত্যনিষ্ঠ বিতর্ক-আলোচনার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের ধর্ম-নিরপেক্ষ চেতনা সমৃদ্ধ হবে এবং মানব-বন্ধন শক্তিশালী হবে—এটাই আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস।

এদেশের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য সমাজসচেতন অধ্যাপক ড: অমলেন্দু দে সংহতি-চেতনা গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'প্রসঙ্গ : অনুপ্রবেশ' প্রকাশের জন্য চারটি প্রবন্ধ দিয়েছেন এবং পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত চারটি রচনাও তাঁর সহযোগিতায় সংগৃহীত হয়েছে। তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য।

প্রুফ সংশোধন ও মুদ্রণ সংক্রান্ত সর্ববিধ কাজে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন শ্রী শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রী তপন দে ও শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল। প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রী সজল রায়। তাঁদের অকৃপণ সহায়তা ভিন্ন এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। তাঁদের প্রতি জানাই আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার।

হুল দিবস ॥ ৩০ জুন, ১৯৯৪ — ড: অতসী কার্ফা

২১৪/১, বামাচরণ রায় রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩৪

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু-জনবিন্যাসে পরিবর্তন

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি এবং ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল যথাক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় চর্চা কেন্দ্রে এবং ইতিহাস বিভাগে আমন্ত্রিত হয়ে আমি বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ এবং বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনবিন্যাস-মানচিত্রের পরিবর্তন বিষয়ক দুটি বক্তৃতায় এই সমস্যার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করি।[১] আমার তৈরি সেই নোট অবলম্বন করেই এই নিবন্ধটি রচনা করেছি। এই সমস্যার প্রতি কারো কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হলেও, অনুপ্রবেশ-সংক্রান্ত সমস্যায় ভারত ও বাংলাদেশ—উভয় রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক আন্দোলন কতটা বিপর্যস্ত হতে পারে, সেই বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণার অভাবও লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে হলে দুটি রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু-জনবিন্যাস সম্বন্ধে তথ্যনির্ভর আলোচনা প্রয়োজন। একই সঙ্গে সংখ্যালঘুদের সমস্যাগুলিও উপলব্ধি করা দরকার। ভারতে ও বাংলাদেশে সংখ্যাগুরু ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তিসমূহ যেভাবে ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে তাতে উভয় রাষ্ট্রের বহু ধর্মীয় রাষ্ট্রিক চরিত্র বিপর্যস্ত হয়ে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, এমন সম্ভাবনাকে লঘু করে দেখার কোনো কারণ নেই। কাশ্মীর, পাঞ্জাব, ভারতের কোনো কোনো অঞ্চল এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা ভাবলে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। সরকারি ও অন্যান্য সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু-জনবিন্যাসের রূপ এবং উভয় রাষ্ট্রে তার প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করেছি।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু-জনবিন্যাসে পরিবর্তনের বিষয়টিকে প্রধান দুটি পর্বে ভাগ করা যায়: (১) প্রাক-১৯৭১ পর্ব এবং (২) ১৯৭১-পরবর্তী পর্ব। প্রথম পর্বের আবার পাঁচটি স্তর রয়েছে: প্রথম ভাগ: ১৯৪৬-১৯৪৯; দ্বিতীয় ভাগ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০—সেপ্টেম্বর, ১৯৫২; তৃতীয় ভাগ: ১৫ অক্টোবর, ১৯৫২—১৯৬০; চতুর্থ ভাগ: ১৯৬০-৬১—১৯৭০; পঞ্চম ভাগ: ১৯৭১। অন্যদিকে দ্বিতীয় পর্বের তিনটি স্তর রয়েছে: প্রথম ভাগ: ১৯৭২—১৯৭৪;

দ্বিতীয় ভাগ : ১৯৭৫—১৯৮৭ ; তৃতীয় ভাগ : ১৯৮৮—১৯৯০। বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে হিন্দুরাই হলো বৃহত্তর অংশ। তাই ঐ দেশ থেকে যারা ভারতে চলে আসে তাদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যাই বেশি।[২]

(১) প্রাক-১৯৭১ পর্বে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘুদের ভারতে প্রবেশ :

এই পর্বে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কি পরিমাণে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

(ক) প্রথম ভাগ : ১৯৪৬—১৯৪৯ : প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে নোয়াখালি ও ত্রিপুরাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমনের সূত্রপাত হয়। তখন উচ্চবর্গের হিন্দুদের একটি অংশ পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার অসম ও ত্রিপুরায় চলে যায়।[৩] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্র স্থাপিত হওয়ার পরে এই রাষ্ট্র আইনের শাসন প্রবর্তন করতে সক্ষম না হওয়ায় সংখ্যালঘুদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে সংখ্যালঘুদের আগমনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তান গঠনের সময়ে মহম্মদ আলি জিন্নাহর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা হয়নি। প্রশাসনিক ব্যবস্থা এমন রূপ ধারণ করে যার ফলে সংখ্যালঘুরা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়।[৪] নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধির অন্য একটি কারণও ছিল। হায়দরাবাদের নিজাম ভারত-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকার সেখানে সেনাবাহিনী পাঠায়, রাজাকারদের উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং হায়দরাবাদ রাজ্যকে সামরিক প্রশাসনের অধীনে রেখে হায়দরাবাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে।[৫] এই ঘটনায় পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের এক অংশের মনোভাব সংখ্যালঘুদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন অঞ্চলে তা লক্ষ্য করা যায়। তার ফলে সংখ্যালঘুরা বিপন্ন বোধ করে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে তাদের আগমন বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে ১'১ মিলিয়ন হিন্দু চলে আসে। তারা ভারতে 'উদ্বাস্তু' নামেই পরিচিতি লাভ করে। এই

উদ্বাস্তুদের মধ্যে ছিল ৩৫০,০০০ শহরের মধ্যবিত্ত, ৫৫০,০০০ গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, ১০০,০০০ কিছু বেশি কৃষক এবং ১০০,০০০ কিছু কম কারিগর।[৬]

(খ) দ্বিতীয় ভাগ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০—সেপ্টেম্বর, ১৯৫২: ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাস থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হওয়ায় অসংখ্য হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অসম রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কারো কারো মতে, 'বন্যার জলস্রোতের' মতোই উদ্বাস্তুদের আগমন ঘটে। এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গেও দাঙ্গা হয়। পূর্ব পাকিস্তানে ও পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ভীত-সন্ত্রস্ত বহু সংখ্যক মুসলমানও অসম ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ৩.৫ মিলিয়ন।[৭] এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ৮ এপ্রিল সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এবং তাদের জীবন বিপদমুক্ত করতে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি 'নেহরু-লিয়াকত চুক্তি' নামে পরিচিত। তাতে উভয় সরকারই ঘোষণা করে, উভয় রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুরা ধর্ম-নির্বিশেষে নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার ভোগ করবে। তাদের জীবন, সংস্কৃতি ও সম্পত্তির ক্ষেত্রে অধিকার নিশ্চিত করা হয়, আর মত প্রকাশের ও ধর্মীয় আচরণের স্বাধীনতাও স্বীকৃত হয়।[৮] 'নেহরু-লিয়াকত চুক্তি' অনুযায়ী দুই রাষ্ট্রের উদ্বাস্তুদের নিজেদের বাসভূমিতে স্থাবর সম্পত্তিতে অধিকারসহ ফিরে যাবার ব্যবস্থা করা হয়। তাতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের আগমন খানিকটা রোধ করা গেলেও, তার প্রবাহ বন্ধ করা যায়নি। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন-ব্যবস্থা হিন্দুদের মধ্যে নিরাপত্তার মনোভাব সৃষ্টি করতে না পারায় এই চুক্তির সুবিধা হিন্দুরা গ্রহণ করতে পারেনি। অন্যদিকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে দাঙ্গার সময়ে যে সমস্ত মুসলমান অসম ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাদের মধ্যে অনেকেই 'নেহরু লিয়াকত চুক্তি'র ব্যবস্থা অনুযায়ী অসম ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ফিরে আসে। ভারতে আইনের শাসন থাকায় এখানে সহজেই এই চুক্তির শর্ত কার্যকর করা সম্ভব হয়। তারপর পশ্চিমবঙ্গ ও অসম রাজ্য থেকে পূর্ব পাকিস্তানে নিরাপত্তার কারণে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ আর ঘটেনি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই চুক্তিকে কার্যকর করার কোনই প্রয়াস হয়নি।[৯] উপরন্তু ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের আইনসভায়

এমন সব আইন পাশ করা হলো, যার ফলে সংখ্যালঘুরা নিজেদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। যে দুটি আইনের প্রয়োগে সংখ্যালঘুদের দুরবস্থা প্রকট হয় এবং তারা কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়, সেই দুটি আইন হলো : [East Bengal Evacuee Property (Restoration Possession) Act of 1951 এবং East Bengal Evacuees (Administration of Immovable Property) Act of 1951][১০]। সংখ্যালঘুরা কিভাবে প্রশাসনিক বৈষম্যের শিকার হয় তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলো এই দুটি আইন।

(গ) **তৃতীয় ভাগ : ১৫ অক্টোবর, ১৯৫২—১৯৬০ :** ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর পাকিস্তান সরকার পাশপোর্ট প্রথা প্রবর্তন করে। তার ফলে সংখ্যালঘুরা আরো শংকিত হয়। পরে ভারতও এই প্রথা চালু করে। তখন থেকে আবার নতুন করে ভারতে হিন্দু উদ্বাস্তুদের প্রবেশ ঘটে। ১৯৫৫-১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের বিভিন্ন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হওয়ায় সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। তাছাড়া ১৯৫২ ও ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান-আইনসভায় এমন দুটি আইন পাশ করা হয় যার ফলে সংখ্যালঘুদের মনোবল ভেঙে যায়। এই দুটি আইনের নাম ছিল : East Bengal Prevention of Transfer of Property and Removable of Documents and Records Act of 1952 এবং East Pakistan Disturbed Persons (Rehabilitation) Ordinance of 1954.[১১]। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী সরকারের অনুমতি ছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের নিজেদের সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবে না। উল্লেখ্য এই, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হওয়ায় সংখ্যালঘুদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। এই নির্বাচনে আইনসভায় ৭২ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু নির্বাচিত এই সরকারের আয়ু ছিল খুবই স্বল্পকালীন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান বাতিল করে আইউব খান ক্ষমতা দখল করেন এবং দশ বছর পাকিস্তানে সেনা শাসকের কর্তৃত্ব বজায় থাকে। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সরকার সংখ্যালঘুদের স্বার্থবিরোধী Pakistan (Administration of Evacuees Property) Act XII of 1957 আইন জারি করে। তারপর Elective Body Disqualification Order of 1959 প্রয়োগ করে ছয়জন বিশিষ্ট সংখ্যালঘু নেতাকে সরকারি অফিসের পক্ষে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।[১২] সুতরাং আগের বৈষম্যমূলক আইনের সঙ্গে আরো দুটি আইন যুক্ত

করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দুর্বল করার ব্যবস্থা হয়। এই অবস্থায় দেশত্যাগের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) **চতুর্থ ভাগ : ১৯৬১—১৯৭০ :** ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দেও দেশত্যাগ অব্যাহত থাকে। ১৯৬২ ও ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সংখ্যালঘুরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের দাঙ্গা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। গণতান্ত্রিক মানুষ দাঙ্গা প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান উদ্যোগী হয়ে দাঙ্গা-বিরোধী প্রচারপত্র প্রকাশ করেন।[১৩] এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গেও কয়েকটি স্থানে দাঙ্গায় মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক শক্তি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা দাঙ্গাকারীদের দমন করতে সক্ষম হওয়ায় সংখ্যালঘুরা ব্যাপকভাবে দেশত্যাগের পথ অনুসরণ করেনি। কিন্তু দাঙ্গার ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘুরা ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ করতে থাকে। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর Defence of Pakistan Ordinance চালু হওয়ায় সেখানে সংখ্যালঘুদের দুরবস্থা বৃদ্ধি পায়। তারপরে আর একটি নির্দেশ জারি করা হয়। তাকে East Pakistan Enemy Property (Lands and Buildings) Administration and Disposal Order of 1965 বলা হয়।[১৪] ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে দশ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে।[১৫] ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ আইউব খান পদত্যাগ করে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ক্ষমতাসীন হয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জারি করেন সামরিক শাসন। পূর্ব পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির সংঘাতে অসংখ্য গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ বলিষ্ঠতা প্রদর্শন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে জীবনদান করলেও, তাঁরা গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হননি। পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামোয় পশ্চিম পাকিস্তানী প্রশাসকদের আমলাতান্ত্রিক আধিপত্য ও সামরিক বাহিনীর একনায়কতন্ত্র পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বারে বারে বিপর্যস্ত করে। উল্লেখ্য এই, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরও সক্রিয় ভূমিকা ছিল। আইনসভার সংখ্যালঘু সদস্যরা পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বহু প্রস্তাব উত্থাপন করেন, এমন কি তাঁরা আইনসভায় সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিরোধিতা করে 'যুক্ত নির্বাচন প্রথা' প্রবর্তনেরও দাবি করেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের প্রস্তাবের ফলেই যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। সামরিক

আইনবলে পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিপর্যস্ত হলেও সেখানকার জীবনধারায় বিকশিত গণতান্ত্রিক চেতনাকে বিনাশ করা সম্ভব হয়নি। তাই সেখানে বারবার গণ-অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছে। আর তাতে ছিল ছাত্র ও যুবকদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।[১৬] অন্যদিকে ভারতের 'সেকিউল্যার' গড়নে নানা ত্রুটি থাকলেও এখানে আইনের শাসন ভেঙে পড়েনি। তাছাড়া ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐতিহ্যটি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। এইসব কারণে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘুরা অসহায় বোধ করেনি। বস্তুত, দেশত্যাগের স্রোতোধারাটি পূর্ব থেকে পশ্চিমমুখীই ছিল। এখানে উল্লিখিত প্রথম পর্বের (প্রাক-১৯৭১ পর্ব) পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু-জনবিন্যাসের মানচিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, কোনো জেলাতেই মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলি বা মহল্লাগুলি বিধ্বস্ত হয়ে যায়নি। বরং দেখা যায়, এখানকার জীবনধারার সঙ্গে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে মুসলমানরা ভারত-গঠনে তাদের ভূমিকা পালন করছে। অনেক ঝড়-ঝাপটা সত্ত্বেও ভারতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ধারাটি যেমন অটুট আছে, তেমনি বহু ধর্মীয় রাষ্ট্রিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যও রয়েছে অক্ষুন্ন। ভারতে আইনের চোখে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর সমান অধিকার স্বীকৃত। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে আইনের শাসন-নির্ভর গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি বলে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যা-লঘু জনসমষ্টি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বসবাস করতে সক্ষম হচ্ছে না। বহু ধর্মীয় রাষ্ট্রিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ক্রমশই লোপ পাচ্ছে। তার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলন স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করতেও সক্ষম হচ্ছে না। ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির প্রভাবই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্মনির্ভর উদারনৈতিক মনন যাতে উজ্জীবিত হতে না পারে, তার জন্য প্রশাসক, ধর্মতত্ত্ব-বিদ্ ও রাজনীতিবিদ্‌দের এক অংশের মধ্যে তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম-তত্ত্ববিদ্ ও রাজনীতিবিদ্‌দের সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠতা এবং পারস্পরিক নির্ভরতা নানা জটিলতারও সৃষ্টি করছে। যার ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন; একই সঙ্গে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে সংখ্যালঘুদের উপরে নেমে আসছে তীব্র আঘাত। এই প্রতিকূল পরিবেশে সংখ্যালঘুরা দিশেহারা হয়ে ভারতেই প্রবেশ করছে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে এইসব কারণে ভারতে ৫২,৮৩,৩২৪ জন সংখ্যালঘুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে।[১৭]

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা দরকার। বাংলা

দেশের দক্ষিণপূর্ব দিকে অবস্থিত চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল হলো বারোটি পার্বত্য উপজাতির আবাসস্থল। তাদের মোট সংখ্যা ছয় লক্ষ। সমতলের মুসলমান সংখ্যাগুরু জনসমষ্টির সঙ্গে তাদের পার্থক্য রয়েছে। এই উপজাতি জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ হলো চাকমা ও মারমা—এঁরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাছাড়া রয়েছে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ত্রিপুরা উপজাতি এবং খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী বম, পাংখুয়া ও মুরু উপজাতি। বৌদ্ধদের তুলনায় হিন্দু ও খ্রিস্টানদের সংখ্যা কম। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ, আর ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠী হিন্দু ও খ্রিস্টান। তাদের মধ্যে অবশ্য উপজাতি জীবনধারার প্রথাগত আচার আচরণ অব্যাহত রয়েছে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল দখল করে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে একটি রেগুলেশন প্রবর্তনের মাধ্যমে এই অঞ্চলের প্রশাসনকে সমতল থেকে আলাদা করা হয় এবং এই অঞ্চলে অবাধ অনুপ্রবেশের উপরে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল হয় পূর্ব পাকিস্তানের অংশ।[১৮] ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পাকিস্তান সরকার কাপ্তাইতে মস্ত বড় একটি হাউড্রো-ইলেকট্রিক বাঁধ নির্মাণ করে। তার ফলে ৫৪,০০০ একর চাষের জমি জলমগ্ন হয়। এর মধ্যে চল্লিশ শতাংশ ছিল উপজাতি কৃষকদের জমি। তাতে একলক্ষ পার্বত্য উপজাতি কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের জমিজমাও হয় হাতছাড়া। খুবই অল্প সংখ্যক কৃষক ক্ষতিপূরণ পায়। সমতলভূমি থেকে উপজাতি অঞ্চলে অবাধে অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। সহস্র সহস্র উপজাতি ভারতের ত্রিপুরা ও অরুণাচল প্রদেশে আশ্রয় নেয়। এইভাবে পাকিস্তান সরকারের নীতির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগোষ্ঠী এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। তাদের চিরাচরিত জীবনধারায় নেমে আসে ভয়ংকর বিপর্যয়।[১৯]

(২) ১৯৭১-পরবর্তী পর্বে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতে অনুপ্রবেশ :

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তি সংগ্রামের সময়ে পাক বাহিনীর হাত থেকে অব্যাহতি লাভের আশায় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ১০ মিলিয়ন বাংলাদেশের নাগরিক আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলিতে। এই আশ্রয়গ্রহণকারী নাগরিকদের

মধ্যে ৮৫% ছিল হিন্দু। আগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে ছিল বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও আদিবাসী জনসমষ্টি। তুলনায় মুসলমান আশ্রয়গ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কেন হিন্দুদের সংখ্যা বেশি ছিল? কারণ তারাই ছিল পাক-বাহিনীর আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য। পাকিস্তানের মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি যে নির্দেশ দেন, তাতে স্পষ্ট করেই বলেন, হিন্দুরা হলো 'কাফের'। তিনি হিন্দুদের হত্যা করতে এবং তাদের সম্পত্তি ধ্বংস করতে নির্দেশ দেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ৯০% হিন্দুর বাড়ি ও সম্পত্তি ধ্বংস ও লুণ্ঠিত হয়।[২০] তা সত্ত্বেও এক নতুন দেশ গঠনের আশায় এই মুক্তিযুদ্ধে সংখ্যাগুরু মুসলিম নাগরিকদের সঙ্গে সংখ্যালঘু নাগরিকরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করে। এইভাবে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অগণিত মানুষের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে যে চারটি আদর্শকে গ্রহণ করা হয়, তা হলো: জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালী জনগণের মিলিত আন্দোলনের ফসল ছিল এই নতুন রাষ্ট্র ও তার সংবিধান।[২১]

(ক) **প্রথম ভাগ : ১৯৭২—৭৪ :** মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের পরে ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী এক কোটি উদ্বাস্তুর বেশির ভাগই নবগঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ফিরে যায়। কিন্তু অচিরেই বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার বিরোধীরা সংগঠিত হতে থাকে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। তারা এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অগ্রগতিতে নানা অন্তরায়ের সৃষ্টি করতে থাকে। এই কারণে দ্বিতীয় পর্বেও বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বিপন্ন বোধ না করে পারে না। পরিবর্তিত অবস্থাতেও তারা বৈষম্যের শিকার হয়। যেসব সংখ্যালঘু নাগরিক স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সাময়িকভাবে ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেয়, তারা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে অনেকেই ফিরে গিয়ে দেখে তাদের সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের আবার নতুন করে বেঁচে থাকার সংগ্রাম শুরু করতে হয়। যাদের কোনো অবলম্বন ছিল না তাদের মধ্যে কেউ কেউ পুনরায় ভারতে চলে আসে। দুঃখের হলেও এটা সত্য, 'গণতান্ত্রিক সেকিউল্যার' আদর্শের প্রবক্তা আওয়ামি লিগ-পরিচালিত সরকার সংখ্যালঘুদের অবস্থার কোনো গুণগত পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়নি। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপরে যে 'রাষ্ট্রীয় অত্যাচার'

চলে তার বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে 'শত্রু-সম্পত্তি' আইনের পরিবর্তে প্রবর্তন করা হলো 'অর্পিত সম্পত্তি' (Vested Property) আইন। কিন্তু সংখ্যালঘুদের হয়রানি করার সমস্ত ধারাই এই আইনে যথারীতি বজায় রাখা হয়েছিল। তার ফলে স্বাভাবিক কারণেই হিন্দুরা আশাহত হয়। 'অর্পিত সম্পত্তি' আইনের নামে হিন্দুদের জমিজমা অন্যায়ভাবে দখল করা হতে থাকে। ফলত, স্বাভাবিকভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়।[২২] ভারত-বিরোধী প্রচারও ক্রমশ প্রবল হতে থাকে। সুতরাং নিরাপত্তার আশায় সংখ্যালঘুদের ভারতে অনুপ্রবেশও অব্যাহত থাকে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত 'ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি'তে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেকার বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগত সংখ্যালঘুদের আগমন-সংক্রান্ত বিষয়টি উল্লিখিত হয়।[২৩] অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয় না। মুক্তি-যুদ্ধের পরে পার্বত্য উপজাতি জনগোষ্ঠী আশা করেছিল, বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক কাঠামোর মধ্যে তারা রাজনৈতিক স্বীকৃতি পাবে এবং একপ্রকার স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতে পারবে। কিন্তু নবগঠিত বাংলাদেশ সরকার তা দিতে অস্বীকৃত হয়।[২৪] ইতিমধ্যে সমতলভূমি থেকে আগত বাঙালী মুসলিম বসবাসকারীদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ সরকার সমতলভূমি থেকে অবসরপ্রাপ্ত মুসলিম সৈনিক ও সাধারণ বাঙালী মুসলমানদের এই অঞ্চলে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়। তার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনবিন্যাস—মানচিত্রের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। বাঙালী মুসলমান বনাম পার্বত্য উপজাতি সংঘাতের ক্ষেত্রও তৈরি হয়। এই অবস্থায় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে 'চিটাগং হিল ট্রাকটস্ পিপলস ইউনাইটেড পার্টি' গঠিত হয়। উপজাতি জনগোষ্ঠী তাদের আবাসস্থলে নিজেদের অধিকার অটুট রাখার জন্য আন্দোলনের সূত্রপাত করে।[২৫] এই সংঘাতকে কেবলমাত্র জাতিগত (ethnic) বিরোধ বললে সমস্যার জটিলতা উপলব্ধি করা যায় না। কারণ এই অঞ্চলে সরকারি নীতির ফলেই ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং দীর্ঘকাল প্রচলিত আঞ্চলিক ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্যটিও বিপর্যস্ত হয়। এই কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা আলোচনায় সংঘাতের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উপাদান সমূহের প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন।[২৬]

(খ) দ্বিতীয় ভাগ : ১৯৭৫—৮৭ : বাংলাদেশে গণতন্ত্র-বিরোধী শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় সংবিধানের মূলনীতিগুলি অবহেলিত হয়। এগুলি কার্যকর করার জন্য রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোনো বলিষ্ঠ প্রয়াসও

পরিলক্ষিত হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান নিহত হন।[২৭] ফলে গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাও ধ্বসে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-বিরোধী এক প্রতিক্রিয়াশীল চক্র রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তির প্রভাব বিস্তারের পথ আরো প্রশস্ত হয়। দ্রুতগতিতে সংবিধানের গণতান্ত্রিক-সেকিউল্যার চরিত্র পরিবর্তন করা হয়। নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সাম্প্রদায়িক দলগুলোর উপরে নির্ভরশীল হন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর শাসনকালেই 'রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী উপাদানসমূহের প্রভাব বৃদ্ধির মাধ্যমে ইসলামী ধারার প্রসার ঘটে। তিনি 'প্রথমে সামরিক আইনের বিধান বলে এবং পরে ১৯৭৭ সালে সংবিধানের ৫ম সংশোধনী অনুমোদনের মাধ্যমে সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি বাদ দেন।'[২৮] তখন থেকে 'ইসলামীকরণ'-এর যে-প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়, তা রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ-এর শাসনকালে পূর্ণতর রূপ ধারণ করে। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতা দখল করার পরেই রাষ্ট্রপতি এরশাদ বাংলাদেশে একটি 'ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলন' আরম্ভ করার বাসনা ব্যক্ত করেন। তিনি ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন, ''ইসলাম ও কোরানের নীতিই হবে দেশের নতুন সংবিধানের ভিত্তি।''[২৯] তারপর থেকে তিনি বিভিন্ন বক্তৃতায় 'ইসলাম প্রতিষ্ঠার' কথা বলতে থাকেন। তাঁর কাজে তিনি পীরের আশীর্বাদও লাভ করেন। এইভাবে রাষ্ট্রপতি এরশাদ সংখ্যাগুরু মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আবেগ জাগ্রত করে নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় করতে চেষ্টা করেন। নাগরিকদের ধর্মীয় পার্থক্যকে প্রকট করে তোলায় সংখ্যালঘুরা আবার বিপন্ন-বোধ করতে থাকে। কারণ, তারাই ছিল ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তির আক্রমণের প্রধানতম লক্ষ্য। 'শত্রুসম্পত্তি' আইন এই ক্ষেত্রে অন্যতম বৈধ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সংখ্যালঘুদের জায়গা-জমি জবরদস্তিমূলক দখল করা শুরু হয়ে যায়। এটাও উল্লেখ্য, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুন রাষ্ট্রপতি এরশাদ 'অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি' আইন সম্বন্ধে একটি আদেশ প্রচার করেন। তাতে বলা হয়, সংখ্যালঘুদের আর কোনো সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হবে না। কিন্তু এই আইনের সাহায্যে যেসব সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তা ফেরত দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা হলো না। এমন কি আইনটি সম্পূর্ণভাবে বাতিল করাও হলো না। তাছাড়া রাষ্ট্রপতি এরশাদ-এর এই আদেশটিও কার্যকর করা হয়নি। তাই তাঁর ঘোষণার পরেও বহু সম্পত্তি সংখ্যালঘুদের হাতছাড়া হয়। বলা

বাহুল্য, এসব ক্ষেত্রে প্রশাসনে ও আদালতে সুবিচার লাভের কোন আশাই ছিল না। বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতেও সংখ্যালঘুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে কয়েকটি জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায় সংখ্যালঘুদের মধ্যে আবার দেশত্যাগের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।[৩০]

একই সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগোষ্ঠীর দুরবস্থাও বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার চার লক্ষ মুসলমানকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এনে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে জমির অভাব দেখা দেয়। ভিন্ন ধর্ম ও জনগোষ্ঠীর মানুষের বসতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের সামরিকীকরণও শুরু হয়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সামরিক শিবির।[৩১] উপজাতিদের অধিকার-রক্ষার্থে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে শান্তিবাহিনী গেরিলা কায়দায় বাংলাদেশ সামরিকবাহিনী এবং বাঙালী মুসলমানদের উপরে আক্রমণ চালাতে থাকে। বাংলাদেশ সামরিকবাহিনীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের খবর চাপা থাকে না; তাছাড়া উপজাতিদের উপরে অত্যাচার করা হচ্ছে এমন সংবাদও প্রচারিত হয়। নির্যাতিত উপজাতির মানুষ প্রাণরক্ষার্থে অবশেষে ভারতে প্রবেশ করে।[৩২]

(গ) তৃতীয় ভাগ : ১৯৮৮—৯০ : ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার ফলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা 'দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে' পরিণত হয়। তাদের দুরবস্থা আরো প্রকট হয়ে ওঠে। সংখ্যালঘুদের মধ্যে হতাশা আর ক্ষোভও বৃদ্ধি পায়। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে এবং নিজের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টা হিসেবে রাষ্ট্রপতি এরশাদ মৌলবাদী গোষ্ঠী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহের উপরে নির্ভরশীল হন। ফলে সংখ্যালঘুদের উপরে আক্রমণের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থার প্রতিকার করে গণতান্ত্রিক দলগুলি জাতীয় রাজনীতির মূল ধারার সঙ্গে সংখ্যালঘুদের যুক্ত করে রাখতে সক্ষম হয়নি। ভীতসন্ত্রস্ত সংখ্যালঘু নাগরিকরা শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগ করতেই বাধ্য হয়।[৩৩]

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারতের বাবরি মসজিদ-রামজন্মভূমি বিতর্কের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই সুযোগ গ্রহণ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপরে নির্যাতন ও নিপীড়ন শুরু হয়ে যায়। সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার করে রাষ্ট্রপতি এরশাদ-পরিচালিত সরকার

গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চেষ্টা করে। সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানে সমাজদ্রোহী দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের মন্দির ধ্বংস করে, ঘরবাড়ি লুট ও অগ্নিসংযোগ করে এবং সমগ্র দেশে কায়েম করে এক ভয়াবহ ত্রাসের রাজত্ব। এই তাণ্ডবলীলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলি কোনো কর্মপন্থা গ্রহণ করতে সক্ষম না হলেও, পরে তাঁরা ও বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষ এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু অক্টোবরের দাঙ্গা সংখ্যালঘুদের মনোবল ভেঙে দেয়। তার ফলেও সংখ্যালঘুদের ভারতে আগমনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।[৩৪]

অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের অবস্থারও কোনো পরিবর্তন হয় না। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদের সরকার 'ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আইন' পাশ করে পার্বত্য অঞ্চলে 'স্বায়ত্তশাসন' প্রবর্তন করে। উপজাতি জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত কাউন্সিল কর্তৃক এই অঞ্চল-শাসনের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু জমিতে তাদের অধিকার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার কোনো ক্ষমতা এই কাউন্সিলের হাতে না থাকায় উপজাতি জনগোষ্ঠীর কোনো সমস্যারই সমাধান হয়নি। নিজেদের বাসস্থান থেকে বিচ্যুত ত্রিপুরার আশ্রয়শিবিরে বসবাসকারী প্রায় ৬০ হাজার উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষের ভবিষ্যৎ সেকারণে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।[৩৫]

(২) সংখ্যালঘু জনবিন্যাস-মানচিত্রে পরিবর্তন :

সেন্সাস রিপোর্ট সব সময়ে নির্ভরযোগ্য না হলেও, তাকে অবলম্বন করেই চলতে হয়। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে যেভাবে বাংলার মুসলিম ও হিন্দু জনসংখ্যা দেখানো হয়, তা নিয়ে এক সময়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ অভিযোগ করেন, মুসলিম জনসংখ্যা বেশি করে এবং হিন্দু জনসংখ্যা কম করে দেখানো হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সেন্সাস রিপোর্টের সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু জনসমষ্টির প্রকৃত সংখ্যা নিয়েও কারো কারো মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই সব সেন্সাস রিপোর্টে জনসংখ্যার যথার্থ প্রতিফলন হয়নি বলে তাদের মনে হয়েছে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে কত সংখ্যক সংখ্যালঘু মানুষ পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভারতে প্রবেশ করে, তার একটি হিসেব

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু শিবিরগুলি ও সরকারি পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া যায়। আগেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যে এক কোটি মানুষ পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে আশ্রয় নেয়, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই নবগঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ফিরে যায়। ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনসমষ্টির একটি অংশ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলিতে থেকে যায় অথবা বিভ্রান্ত হয়ে বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসে। এখানে উল্লিখিত দ্বিতীয় পর্বেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষ বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নেয়। এই পর্বের আর একটি লক্ষণীয় দিক হলো, বাংলাদেশ থেকে সংখ্যাগুরু মুসলিম জনসমষ্টিও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের ও ভারতের সেন্সাস রিপোর্টসমূহ বিশ্লেষণ করে উভয় রাষ্ট্রের জনবিন্যাস সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। প্রথমে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিষয়ে আলোচনা করা হলো। ১৯৬১-১৯৭৪ এবং ১৯৭৪-১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের বাংলাদেশের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে সেখানকার সংখ্যালঘু-জনসংখ্যার একটি হিসেব পাওয়া যায়। ধর্ম অনুযায়ী পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার শতকরা হার এখানে উল্লেখ করা হলো :[৩৬]

সেন্সাস বছর	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য
১৯০১	৬৬.১	৩৩.০	—	—	০.৯
১৯১১	৬৭.২	৩১.৫	—	—	১.৩
১৯২১	৬৮.১	৩০.৬	—	—	১.৩
১৯৩১	৬৯.৫	২৯.৪	—	০.২	১.০
১৯৪১	৭০.৩	২৮.০	—	০.১	১.৬
১৯৫১	৭৬.৯	২২.০	০.৭	০.৩	০.১
১৯৬১	৮০.৪	১৮.৫	০.৭	০.৩	০.১
১৯৭৪	৮৫.৪	১৩.৫	০.৬	০.৩	০.২
১৯৮১	৮৬.৬	১২.১	০.৬	০.৩	০.৩

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ থেকে মুসলিম জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে একই সময়কালে হিন্দু জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। বৌদ্ধ-জনসংখ্যাও হ্রাস পায়। খ্রিস্টান-জনসংখ্যা একই রকম থাকে। হিন্দু-জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণ হিসেবে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত বিভাগ, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত-পাক যুদ্ধ এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধ উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেন্সাস রিপোর্টে অন্য কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি।[৩৭]

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের বাংলাদেশ সেন্সাস রিপোর্ট থেকে শহরের ও গ্রামের এবং চারটি পরিসংখ্যান সংক্রান্ত মহানগরীর (Four Statistical Metropolitan Areas) জনসংখ্যার বিষয়ে জানা যায়। শহরের ও গ্রামের হিন্দু-জনসংখ্যার যথাক্রমে হার হলো ১১'৬% এবং ১২'২%। চারটি মহানগরীতে, যথা—চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা ও রাজশাহীতে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। চট্টগ্রাম মহানগরীতে তুলনামূলকভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ জনসংখ্যার উচ্চ হার পাওয়া যায়। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ জনসংখ্যার মিলিত হার হলো ১১'৮%। খুলনা মহানগরীতে খ্রিস্টান জনসংখ্যার উচ্চ হার লক্ষ্য করা যায়। এখানে হিন্দু ও খ্রিস্টান জনসংখ্যার মিলিত হার হলো ১৩.২%। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে শহরে ও গ্রামে সম্প্রদায়ভিত্তিক জনসংখ্যার হার সম্বন্ধে এই তথ্য পাওয়া যায় :[৩৮]

	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য
বাংলাদেশ	৮৬'৬	১২'১	০'৬	০'৩	০'৩
শহর	৮৬'৯	১১'৬	৩'৫	০'৮	০'২
গ্রাম	৮৬'৬	১২'২	০'৬	০'৩	০'৩
সকল মহানগরী	৯১'৪	৭'৪	০'২	০'৮	০'২
চট্টগ্রাম মহানগরী	৮৮'২	১০'৭	০'৭	০'৩	০'২
ঢাকা মহানগরী	৯৩'৩	৫'৮	০'১	০'৫	০'২
খুলনা মহানগরী	৮৬'৭	৯'৫	০'০	৩'৭	০'১
রাজশাহী মহানগরী	৯১'৯	৭'২	০'০	০'৬	০'৩

এবার ১৯৭৪ ও ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের বাংলাদেশ সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ধর্মসম্প্রদায়গত চিত্রটি শতাংশ হিসেবে তুলে ধরা হলো :[৩৯]

১৯৪৭

জেলা / ডিভিসন	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য
বাংলাদেশ	৮৫'৪	১৩'৫	০'৬	০'৩	০'২
চট্টগ্রাম ডিভিসন	৮৫'৩	১২'১	২'৩	০'২	০'১
বন্দরবন	—	—	—	—	—
চিটাগং হিল ট্রাকটস্	১৮'৯	১০'৪	৬৬'৫	২'৬	১'৬
চট্টগ্রাম	৮৩'৮	১৪'১	১'৯	০'১	০'১

জেলা/ডিভিসন	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য
কুমিল্লা	৯০·২	৯·৭	০·০	০·০	০·১
নোয়াখালি	৯২·৮	৭·২	০·০	০·০	০·০
শ্রীহট্ট	৮২·৬	১৬·৯	০·১	০·২	০·২
ঢাকা ডিভিসন	৮৭·৬	১১·৮	০·০	০·৫	০·১
ঢাকা	৮৭·৮	১১·[illegible]	০·০	০·৭	০·১
ফরিদপুর	৭৬·৪	২৩·৩	—	০·৩	০·০
জামালপুর	—	—	—	—	—

১৯৭৪

জেলা / ডিভিসন	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য
ময়মনসিং	৯৩·৪	৬·০	০ ০	০·৫	০·১
টাঙ্গাইল	৮৭·৬	১২·০	—	০·২	০·২
খুলনা ডিভিসন	৮১·০	১৮·৭	০·০	০·২	০·১
বরিশাল	৮২·৮	১৭·০	—	০·১	০·১
যশোহর	৭৮·০	২১·৯	—	০·১	—
খুলনা	৭১·২	২৮·৩	০·০	০·৪	০·১
কুষ্ঠিয়া	৯৫·২	৪ ৭	—	—	০·১
পটুয়াখালি	৮৮·৮	১০·৯	০·৩	—	—
রাজশাহী ডিভিসন	৮৮·৮	১০·৯	০·৩	—	—
বগুড়া	৯২·১	৭·২	—	০·৪	০·২
দিনাজপুর	৭৫·১	২৩·৭	—	০·৫	০·৭
পাবনা	৯০·৪	৯·২	—	০·৩	০·১
রাজশাহী	৮৬·০	১৩·০	০·১	০·২	০·৭
রংপুর	৮৭·৬	১২·০	—	০·২	০·২

১৯৮১

জেলা/ডিভিসন	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য
বাংলাদেশ	৮৬·৬	১২·১	০·৩	০·৩	০·৩
চট্টগ্রাম ডিভিসন	৮৫·৬	১১·৭	২·৩	০·২	০·২
বন্দরবন	৪১·৫	২·৯	৪৩·৯	৮·২	৩·৫

জেলা/ডিভিসন	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য
চিটাগং হিলট্রাকটস	৩২.৪	১১.৪	৫৫.০	০.৯	০.৩
চট্টগ্রাম	৮৪.৫	১৩.০	২.২	০.১	০.২
কুমিল্লা	৯১.৬	৮.২	০.১	০.০	০.১
নোয়াখালি	৯৩.০	৬.৯	০.০	০.১	০.০
শ্রীহট্ট	৮১.৩	১৮.০	০.০	০.৩	০.৪
ঢাকা ডিভিসন	৮৯.৭	৯.৭	০.০	০.৫	০.১
ঢাকা	৯০.৫	৮.৯	০.১	০.৪	০.১
ফরিদপুর	৮০.৯	১৮.৮	০.০	০.৩	০.০
জামালপুর	৯৬.৮	২.৭	—	০.৪	০.১
ময়মনসিং	৯১.৮	৭.৪	—	০.৬	০.২
টাঙ্গাইল	৯০.৬	৯.২	—	০.২	০.১
খুলনা ডিভিসন	৮২.৪	১৭.১	০.০	০.৪	০.১
বরিশাল	৮৪.৫	১৫.১	০.০	০.৩	০.১
যশোহর	৮০.৩	১৯.৬	—	০.১	০.০
খুলনা	৭১.৯	২৭.২	০.০	০.৮	০.১
কুষ্ঠিয়া	৯৫.১	৪.৫	—	০.৩	০.১
পটুয়াখালি	৯০.৩	৯.৪	০.২	০.০	০.১
রাজশাহী ডিভিসন	৮৭.৪	১১.৬	০.০	০.২	০.৮
বগুড়া	৯১.১	৮.৪	—	০.১	০.৪
দিনাজপুর	৭৫.৯	২১.৯	০.০	০.৬	১.৬
পাবনা	৯২.৫	৭.৩	—	০.১	০.১
রাজশাহী	৮৮.৬	৯.৫	০.০	০.৪	১.৫
রংপুর	৮৮.০	১১.৬	০.০	০.১	০.৩

এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনসমষ্টির বার্ষিক-বৃদ্ধির গড় হার ভয়ানকভাবে হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে সংখ্যাগুরু মুসলিম সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।[৪০] পুনরায় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের ৩৯ লক্ষ ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনসংখ্যা হ্রাস পায়। তারা কোথায় গেল? এই প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর বাংলাদেশ সরকারের সূত্র থেকে পাওয়া যায় না। প্রতিবেশী রাষ্ট্রে তাদের বহির্গমন ঘটেছে বলে অনেকে অনুমান করেন।[৪১]

উপরন্তু, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে আরো ৩৬ লক্ষ ধর্মীয় সংখ্যালঘু ভারতে প্রবেশ করে।[৪২] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে এক কোটি আঠাশ লক্ষ ধর্মীয় সংখ্যালঘু ভারতে প্রবেশ করে।[৪৩] এইভাবে বাংলাদেশের জনবিন্যাস-মানচিত্রে পরিবর্তন ঘটে।

(৩) বাংলাদেশের নাগরিকদের দেশত্যাগের আরো কয়েকটি কারণ :

বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের নাগরিকরা দেশত্যাগ করে ভারতে প্রবেশ করছে। তাদের মধ্যে শুধু ধর্মীয় সংখালঘুরাই নয়, ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মুসলমানরাও রয়েছে। তাদের প্রধানত দুটো ভাগে বিভক্ত করা যায় : (১) **ধর্মীয় সংখ্যালঘু :** (ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ; (খ) হিন্দু ও খ্রিস্টান ; (গ) বিভিন্ন উপজাতি। (২) **ধর্মীয় সংখ্যাগুরু :** বাঙালী ও বিহারী মুসলিম। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত-বিভাগের পরে বহু অবাঙালী মুসলিম পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে বসবাস শুরু করে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের পরে এইসব বিহারী মুসলিম ভারতে প্রবেশ করাই নিরাপদ মনে করে। তাদের পক্ষে এখানকার উর্দুভাষী মুসলমানদের মধ্যে সহজেই মিশে যাওয়া সম্ভব হয়। প্রধানত যে-সব কারণে বাংলাদেশী সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু জনসাধারণের বহির্গমন ঘটে, তা এখানে উল্লেখ করা হলো : ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মুসলিম জনবিন্যাসের উধর্বগতি। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে দেশত্যাগ করে। আর ধর্মীয় সংখ্যাগুরুরা ভারতে প্রবেশ করে অর্থনৈতিক কারণে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামীকরণের ও সামরিকীকরণের নীতি কার্যকর করায় বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রিস্টান উপজাতির অধিবাসী তাদের নিজেদের বাসভূমি ত্যাগ করে ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচল রাজ্যে আশ্রয় নেয়।[৪৪] পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সামরিক, আধা-সামরিক ও পুলিস বাহিনী তিনটি পার্বত্য জেলাতেই জমি অধিগ্রহণ করে তাদের শিবির স্থাপন করেছে। এইসব বাহিনীর মোট সংখ্যা হলো ৬০ হাজার। তাছাড়া রয়েছে আনসার ও গ্রামরক্ষা বাহিনীর সদস্যেরা। নাগরিকদের নিয়ে গঠিত এই আধা-সামরিক বাহিনীও বিশাল। সুতরাং সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামেই সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব

বজায় রয়েছে। কোনো স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা না থাকায় উপজাতি জনগোষ্ঠী এক অস্বাভাবিক পরিবেশের সম্মুখীন হয়েছে।[৪৫] সম্প্রতি মায়ানমার থেকে বিতাড়িত ছিন্নমূল রোহিঙ্গা মুসলমানদের পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ পারিপার্শ্বিককে আরো জটিল করে তুলেছে। তাদের সঙ্গে উপজাতিদের বিরোধের সূত্রপাত হয়েছে। উদ্বাস্তু উপজাতি জনগোষ্ঠীর ভারতে প্রবেশ ঘটছে। সহজেই অনুমান করা যায়, রোহিঙ্গা মুসলমানদের একটি বড় অংশ মায়ানমার ফিরে যাবে না। এই অবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সমস্যায় আর একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হবে।[৪৬]

বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কিভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, তার আরো কিছু দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের প্রতি প্রশাসনের বৈমাত্রেয় সুলভ ব্যবহার আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া 'অর্পিত সম্পত্তি' আইনের প্রয়োগে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তারা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার কথাও আলোচনা করা হয়েছে। সংখ্যালঘুরা কিভাবে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে তা এখানে উল্লেখিত তথ্য থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথমেই বাংলাদেশ পার্লামেন্টে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব কিভাবে হ্রাস পেয়েছে তা উল্লেখ করা যাক :[৪৭]

বছর	মোট সদস্য	ধর্মীয় সংখ্যালঘু সদস্যের সংখ্যা
১৯৫৪	৩০৯	৭২
১৯৭০	৩০০	১১
১৯৭৩	৩১৫	১২
১৯৭৯	৩১৫	৮
১৯৮৬	৩১৫	৭
১৯৮৮	৩৩০	৪
১৯৯১	৩১৫	১১

সংখ্যালঘু জনসংখ্যার হিসেব অনুযায়ী তাদের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা হওয়া উচিত ৬০, কিন্তু গত কুড়ি বছর ধরে তা হয়েছে ১০।[৪৮]

প্রতিরক্ষা বিভাগে সংখ্যালঘুদের সংখ্যাও উল্লেখ করার মতো নয়। সেনাবাহিনীতে ৮০ হাজার 'জওয়ান' (সৈনিক), তার মধ্যে ৫০০ 'জওয়ান'

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত।[৪৯] সেনাবাহিনীর উচ্চপদে তাদের সংখ্যা আরো নগণ্য। এখানে তা উল্লেখ করা হলো :[৫০]

পদ	মোট সংখ্যা	সংখ্যালঘুদের সংখ্যা
সেকেণ্ড লেফটেনাণ্ট / লেফটেনাণ্ট	৯০০	৩
ক্যাপটেন	১,৩০০	৮
মেজর	১,০০০	৪০
লেফটেনাণ্ট কর্ণেল	৪৫০	৮
কর্ণেল	৭০	১
ব্রিগেডিয়ার	৬৫	০
মেজর জেনারেল	২২	০
মোট	৩,৮০৭	৬০

বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীতে (Border Defence Force) ৪০,০০০ জওয়ান, তার মধ্যে ৩০০ জওয়ান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত। সাধারণ স্তরের পুলিসের সংখ্যা ৮০,০০০, তার মধ্যে ২০০০ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের।[৫১] উচ্চপদস্থ পুলিসের মধ্যে সংখ্যালঘুদের অবস্থান নীচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে :[৫২]

পদ	মোট সংখ্যা	সংখ্যালঘুদের সংখ্যা
অ্যাসিসটাণ্ট সুপারিনটেনডেণ্ট অব পুলিস/অ্যাসিসটাণ্ট কমিশনার	৬৩৫	৪০
ডেপুটি এস পি / অ্যাডিশন্যাল এস পি	৮৭	২
এস পি / অ্যাসিসটাণ্ট ইনস্পেক্টর জেনারেল	১২৩	১০
ডি আই জি	১৮	১
অ্যাডিশন্যাল আই জি	৬	০
আই জি	১	০
মোট	৮৭০	৫৩

বিদেশ, স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কোনো সংখ্যালঘু পদস্থ ব্যক্তি নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক বিভাগের অর্থাৎ সেক্রেটারিয়েটের অবস্থা এখানে উল্লেখিত তথ্য থেকে বোঝা যাবে :[৫৩]

পদ	মোট সংখ্যা	সংখ্যালঘুদের সংখ্যা
(ক) অফিসার ও কর্মচারী	৬,৫০০	৩৫০
(খ) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসার	৩৮,৪০৫	(খ) থেকে (ছ) পর্যন্ত পদে ৩% থেকে ৫%
(গ) তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর অফিসার	৬৯৬,০০০	
(ঘ) স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণীর অফিসার	৪৬,৮৯৪	
(ঙ) স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় শ্রেণীর অফিসার	৩১,০০১	
(চ) স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে তৃতীয় শ্রেণীর অফিসার	১৫১,৩০৫	
(ছ) স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চতুর্থ শ্রেণীর অফিসার	১৩৯,২০৮	
(জ) সেক্রেটারী	৪৯	০
(ঝ) অ্যাডিশন্যাল সেক্রেটারী	২৬	০
(ঞ) জয়েন্ট সেক্রেটারী	১৩৪	৩
(ট) ডেপুটি সেক্রেটারী	৪৬৩	২৫
(ঠ) শুল্ক দপ্তর	১৫২	১
(ড) আয়কর বিভাগের অফিসার	৪৫০	৮

সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, ও শিল্প ব্যাংকের ৩৭ জন জেনারেল ম্যানেজারের মধ্যে একজন মাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাতজন ডাইরেক্টরের মধ্যে একজনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নন।[৫৪] বাংলাদেশ ব্যাংকের ৩৭ জন গবর্নরের পদমর্যাদার অফিসার ও জেনারেল ম্যানেজারের মধ্যে মাত্র তিনজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। সোনালী ব্যাংকের পাঁচজন ডাইরেক্টর, অগ্রণী ব্যাংকের চারজন ডাইরেক্টর, শিল্প ব্যাংকের সাত জন ডাইরেক্টর এবং কৃষি ব্যাংকের পাঁচজন ডাইরেক্টর। তাঁদের মধ্যে একজনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নন।[৫৫] সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজনও রাষ্ট্রদূত অথবা হাই কমিশনার নেই। বিদেশে বাংলাদেশ মিশনের নিম্নপদে মাত্র দুজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অফিসার আছেন।[৫৬] রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত মিল ও ফ্যাক্টরীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১% অফিসার, ৩% থেকে ৪%

কর্মচারী এবং ১% কম শ্রমিক আছেন।[৫৭] ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্পে বৈষম্য-মূলক নীতির ফলে সংখ্যালঘুদের পক্ষে লাইসেন্স সংগ্রহ করা কষ্টকর হয়। এমনকি তারা নতুন শিল্প-স্থাপনের বিষয়ে এবং আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা লাভে বঞ্চিত হয়। তার ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা পঙ্গু হয়ে পড়ে।[৫৮] বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পাট ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত মারোয়াড়ি সম্প্রদায়ের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়েও তারা প্রচুর অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে। বাংলাদেশ সরকার তাদের লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ করে দেয়। জমি-জমা বিক্রি করার অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত হয়। এইভাবে বাংলাদেশের মারোয়াড়িরাও বৈষম্যের শিকার হয়েছে।[৫৯]

বাংলাদেশে ঐশ্লামিক প্রতিষ্ঠান ও পবিত্র স্থান সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করলেও হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধ মঠ ও খ্রিস্টান গির্জার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনই প্রয়াস হয়নি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত ধর্মস্থান পুনর্নির্মাণ করারও কোনো উদ্যোগ সরকারি কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেনি। সরকারি ও বে-সরকারি অফিসের সংলগ্ন স্থানে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রার্থনার জন্য মসজিদও নির্মিত হচ্ছে। কিন্তু এই ধরনের কোনো সুযোগ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানদের জন্য প্রদান করা হচ্ছে না। প্রতিটি সরকারি অনুষ্ঠানে শুধু পবিত্র কোরান গ্রন্থই পাঠ করা হয়, অন্য কোনো পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করা হয় না। এমন কি রাষ্ট্র-পরিচালিত রেডিও ও টেলিভিশন তাদের কর্মসূচী শুরু ও শেষ করার সময়ে কেবলমাত্র পবিত্র কোরান গ্রন্থ থেকেই পাঠ করে। অন্য কোনো ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ করা হলেও তা ততটা গুরুত্ব সহকারে করা হয় না।[৬০] ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় ইসলাম ধর্মতত্ত্বের ঔদার্যবোধ ও আধ্যাত্মিক নৈতিকতার উপাদানগুলি এমনভাবে বিকশিত করার কোনো সরকারি প্রয়াস নেই, যাতে বাংলাদেশের সকল ধর্মের মানুষ নিজ ধর্মের প্রতি অনুগত থেকেও অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারে। স্বভাবতই তার ফলে সাধারণ মুসলমান নাগরিকরাও ইসলামের ঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন না। হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত বিখ্যাত 'মদিনা-সনদ' সম্বন্ধেও তাদের কোনো স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠে না।[৬১] সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি বিদ্যালয়েই ইসলাম ধর্ম শিক্ষার জন্য ধর্মীয় শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করছে মাদ্রাসার (ঐশ্লামিক বিদ্যালয়) জন্য। এমন কি সরকারি উদ্যোগে

ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় সংখ্যালঘু ছাত্রদের ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের ধর্ম শেখানোর এমন কোনো ব্যবস্থা সরকার থেকে করা হয়নি। নামে মাত্রই কিছু সংস্কৃত টোল ও পালি প্রতিষ্ঠান বিরাজ করছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য কিছু সংখ্যক ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ করা হলেও তাঁরা মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষকদের তুলনায় বেতন ও সুযোগ-সুবিধা কম পেয়ে থাকেন।[৬২] এমন কোনো তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনার ব্যবস্থা সরকার পক্ষ থেকে করা হয়নি যাতে সংখ্যাগুরু মুসলিম ও সংখ্যালঘু ছাত্ররা ইসলাম ও অন্য ধর্মের আধ্যাত্মিক নৈতিকতার সঙ্গে সহজেই পরিচিত হতে পারে। তাতে ধর্মান্ধতার পরিবর্তে ঔদার্যবোধের পথটি প্রশস্ত হতে পারত। তাছাড়া সরকার পক্ষ থেকে যেসব স্কুলপাঠ্য বই চালু করা হয়েছে, তাতে কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মেরই গৌরবগাথা ব্যক্ত করা হয়। অন্য ধর্ম সম্বন্ধে এমন ধরনের মনোভাব কিন্তু লক্ষ্য করা যায় না।[৬৩]

বাংলাদেশে যেভাবে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রচলিত হয়েছে, তাতে সম্প্রদায়গত মনোভাবই ছড়িয়ে পড়ছে। সরকারি ও অনুমোদিত মাদ্রাসা ছাড়াও আরো কয়েক ধরনের মাদ্রাসার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে এই মাদ্রাসাগুলির নাম হলো খারিজী বা কওমী মাদ্রাসা, ফুরকানিয়া মাদ্রাসা ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা। সম্প্রতি মাদ্রাসা-শিক্ষার যে সংস্কার সাধন করা হয়েছে, তাতে মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষালাভ করা যায়। মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীতে ইসলাম ধর্ম ও ইসলামের ইতিহাসের উপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই পাঠ্যসূচীতে 'সেকিউল্যার' উপাদান সাধারণ বিদ্যালয় বা কলেজের মতো ততটা নেই।[৬৪] সুতরাং বাংলাদেশে এই দুটো ধারা থেকে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব ছাত্ররা আসছে, তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো, ইসলাম ধর্ম ও ইসলামের ইতিহাস কোর্সে পাশ করা ছাত্র-সম্প্রদায়। মাদ্রাসার ইবতিদাঈ, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল স্তরের পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে, এখানে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের আধ্যাত্মিক নৈতিকতার উপাদান সম্বন্ধে ছাত্রদের সচেতন করার কোনো প্রয়াস নেই। সমস্ত পাঠ্যসূচীই ইসলাম ধর্ম-বিষয়ক। স্বভাবতই অন্য ধর্মের আধ্যাত্মিক-নৈতিকতার আদর্শের সঙ্গে মাদ্রাসা-শিক্ষায় শিক্ষিতদের পরিচিত হওয়ার কোনো সুযোগই নেই।[৬৫] তার ফলে মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্যবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। তাই

সম্প্রতিকালে উচ্চশিক্ষার প্রাঙ্গণে তাদের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে সেকিউলার উপাদানের প্রভাব থাকলেও তাদের মধ্যেও সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্যবোধ উজ্জীবিত করা হচ্ছে। ডিগ্রিলাভ করে এই ছাত্ররাই আবার বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হচ্ছে এবং তাদের মাধ্যমে সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্যবোধ অব্যাহত থাকছে। এই কারণেই বাংলাদেশে ধর্ম-নিরপেক্ষতার আদর্শ সর্বক্ষেত্রে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। এর ফলে সামাজিক জীবনে এক গভীর আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।[৬৩] বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে ধর্মীয় মৌলবাদী ছাত্রদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদ্রাসা-শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলেও ধর্মীয় মৌলবাদী গ্রুপগুলি শক্তিশালী হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ও প্রশাসন-ব্যবস্থায় তাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই অবস্থায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনসমষ্টি এক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। রাজধানী ঢাকা শহরে গণতান্ত্রিক শক্তির উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া গেলেও, বাংলাদেশের মফস্বল অঞ্চলে তার প্রভাব এমন নয় যে, সেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। আইনের শাসন অবলম্বন করে প্রশাসন-ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের পূর্বে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সহজ নয়, তা বলাই বাহুল্য।[৬৭]

উল্লেখ্য এই, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে বেশি পশ্চাদপদ হলো শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের তপসিলী ও হরিজন-জনগোষ্ঠী। তাছাড়া উপজাতি জনগোষ্ঠীর অবস্থাও শোচনীয়। দু'লক্ষ গারো, দু লক্ষ মণিপুরী, এক লক্ষ রাখাইনি ও অন্যান্য উপজাতিগোষ্ঠীও অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে বৈষম্যের শিকার হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। বৃহত্তর শ্রীহট্ট জেলায় এক লক্ষ সংখ্যালঘু চা-শ্রমিক এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে বাস করছে। তাছাড়া রয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কামার, কুমোর, তাঁতী, জেলে ইত্যাদি, যারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে বিপর্যস্ত।[৬৮] তাদের উন্নতির জন্য বাংলাদেশ সরকার কোনো বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন অথবা কোনো গবেষক মহল তাদের অবস্থার পর্যালোচনা করেছেন এমন তথ্য আমি পাইনি।

এবার বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যাগুরু জনসমষ্টির বাঙালী ও বিহারী মুসলমানদের ভারতে আগমনের বিষয়ে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলছি। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পরে বিহারী মুসলমানরা ঢাকায় ও অন্যত্র কয়েকটি শিবিরে বসবাস করতে থাকে। তাদের নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা সরকার

থেকে করা হয়। শিবিরের অসহনীয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় তারা ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকেই নানাভাবে ভারতে প্রবেশ করতে থাকে। বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে উর্দুভাষী বিহারী মুসলমানদের বৈরিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠায় এবং তাদের সবাইকে পাকিস্তান সরকার নিতে সম্মত না হওয়ায়, 'সেকিউল্যার' ভারতকে তারা নিরাপদ আশ্রয়স্থল মনে করে। বাঙালী মুসলমানরাও জীবিকার সন্ধানে ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যের অসম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহারের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল ও ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। তারা প্রধানত অর্থনৈতিক কারণেই দেশত্যাগ করে। বাংলাদেশের প্রকট দারিদ্র্য থেকে অব্যাহতি লাভের আশায় মুসলিম জনসমষ্টির মধ্যে ক্রমবর্ধমান বহির্গমন শুরু হয়। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে তার মাত্রা খুবই বৃদ্ধি পায়। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে প্রকাশিত একটি তথ্য থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের ১১% পরিবারের মাথার উপরে কোনো আচ্ছাদন নেই। রাস্তার ধারে, গাছের নীচে ও রেলওয়ে স্টেশনে তারা বাস করে।[৬৯] তাদের মধ্যে মুসলিম জনসমষ্টির সংখ্যাই বেশি। তাদেরই একটি অংশ বাংলাদেশের বাইরে চলে যাচ্ছে।

(৪) **পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ-সমস্যার সাম্প্রতিক চিত্র :** ভারতের সেন্সাস রিপোর্টসমূহ থেকে মুসলিম জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার সম্বন্ধে এই চিত্র পাওয়া যায় :[৭০]

বছর	জনসংখ্যা (দশলক্ষে)	ধর্ম অনুযায়ী জনসংখ্যার শতকরা হার		
		হিন্দু	মুসলিম	শিখ
১৯৫১	৩৬১.১	৮৫.০	৯.৯	১.৭
১৯৬১	৪৩৯.২	৮৩.৫	১০.৭	১.৮
১৯৭১	৫৪৮.২	৮২.৭	১১.২	১.৯

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ভারতের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যার হার ছিল ২০.৪৬% এবং ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২১.৫১% হয়।[৭১] ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ছিল ৫৪, ৫৮০, ৬৪৭।[৭২] এই সময়ে বিভিন্ন জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা বীরভূম জেলার ৩১% থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার ৫৮.৬৬% সীমারেখার মধ্যেই ছিল ;[৭৩] পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ এবং উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মুসলিম জনসংখ্যা এই সীমারেখার মধ্যেই রয়েছে। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে এখানে মুসলিম জনসংখ্যার হার উল্লেখ করা হলো :[৭৪]

জেলা	জনসংখ্যার শতকরা হার
পশ্চিম দিনাজপুর	৩৬·৭৯%
বীরভূম	৩০·৯৭%
মালদহ	৪৫·২৭%
মুর্শিদাবাদ	৫৮·৬৬%

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যার এক দশকের বৃদ্ধির হার (decadal growth rate) হলো ২৯·৬%, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সামগ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হলো ২৩·২%।[৭৫] সুতরাং এই তথ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম জনসংখ্যার চিত্র সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা করা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো: গত এক দশকে (১৯৮০-১৯৯০) কত সংখ্যক বাংলাদেশী ভারতে প্রবেশ করেছে? বাংলাদেশের সেন্সাস রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনা করে এবং পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ নতুন রেশন কার্ড বিলি করা হয়েছে, তা থেকে কেউ কেউ বলেন, গত এক দশকে ১০ মিলিয়ন অথবা ১০ থেকে ১৪ মিলিয়ন বাংলাদেশী ভারতে প্রবেশ করেছে।[৭৬] তাদের মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা বেশি হলেও সংখ্যাগুরু মুসলমানদের সংখ্যাও কম নয়। বলাবাহুল্য, এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলিতে, কলকাতা ও আরো কয়েকটি শহরের মুসলিম জনসংখ্যা এতটা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে সরকারিভাবে কোনো নির্ভরযোগ্য সংখ্যা না পাওয়া গেলেও, এই অনুপ্রবেশ যে ঘটছে তা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারও স্বীকার করেন।[৭৭] ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পার্লামেন্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী এম. এম. জেকব বলেন, এক লক্ষ বাংলাদেশী নাগরিক দিল্লীতে এবং ৫·৮৭ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে।[৭৮] এই বিবৃতিতে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশীদের প্রকৃত সংখ্যা উল্লেখিত হয়নি।[৭৯] উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার শিবিরে ৭·৫ লক্ষ বিহারী মুসলিম আশ্রয় নেয়। এখন সেখানে মাত্র ২ লক্ষ বিহারী মুসলিম রয়েছে বলে কোনো কোনো সূত্রে জানা যায়। সৌদী আরব সরকারের মধ্যস্থতায় শিবিরবাসী বিহারীদের মধ্যে মাত্র ৩৩,০০০ পাকিস্তানে আশ্রয় পেয়েছে। তাহলে বাদ বাকী বিহারী মুসলিম, যাদের সংখ্যা হবে ৫ লক্ষ, কোথায় গেল? তারা যে ভারতে প্রবেশ করেছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং দিল্লীতে নতুন গড়ে ওঠা বাংলাদেশী মুসলমানদের কলোনীগুলি থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমন

কি পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষি খামারগুলিতেও তারা মজুর হিসেবে নিযুক্ত রয়েছে।[৮০] আগেই বলা হয়েছে, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করার পরে 'হিন্দু অনুপ্রবেশকারী'-র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মতে, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ২৮ লক্ষ বাংলাদেশী নাগরিক পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে এবং তাদের মধ্যে ৫ লক্ষেরও বেশি থেকে যায়।[৮১] ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে কত সংখ্যক অনুপ্রবেশকারী ভারতে আশ্রয় নিয়েছে তার শেষ সুনির্দিষ্ট সংখ্যা সরকারি সূত্রে পাওয়া যায় না। অবশ্য সরকারি তথ্য থেকে জানা যায়, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে মাত্র ২০% নরনারীকে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিস গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।[৮২]

সম্প্রতি এই অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত সমস্যাটি রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি ডি. এন. চক্রবর্তীর মতে, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫ মিলিয়নের বেশি মানুষ বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ করেছে।[৮৩] ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মতে, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রায় ৬ মিলিয়ন মানুষ প্রবেশ করে এবং একমাত্র কলকাতা শহরেই বাস করছে ১·২ মিলিয়ন অনুপ্রবেশকারী।[৮৪] এই রাজ্য কমিটি এক প্রস্তাব গ্রহণ করে দাবি করেছে, বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু ও চাকমা উদ্বাস্তুদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হোক, মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের নয়।[৮৫]

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বাংলাদেশী মুসলিমরা পশ্চিমবঙ্গে 'বাংলাদেশ মোহাজির সংঘ' নামে একটি সংস্থা গঠন করে। এই সংস্থা গঠনে সহায়তা করেছে 'বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ'। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি 'বাংলাদেশ মোহাজির সংঘের' মুখপাত্র আবদুল জলিল সানা কলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি প্রেস কনফারেন্সে বলেন, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এক লক্ষ বাংলাদেশী রয়েছে এবং অবৈধভাবে আসা আরো অনেক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী দিল্লী, বোম্বে ও আহমদাবাদে ছড়িয়ে রয়েছে। এদের মোট সংখ্যা হবে ৫ লক্ষ। লক্ষণীয় যে, এই প্রেস কনফারেন্সে যে মুদ্রিত ইস্তাহারটি সাংবাদিকদের দেওয়া হয়, তাতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে মুসলিম ও কয়েকজন হিন্দুও রয়েছে।[৮৬] সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় জানা যায়, ৭ লক্ষ বাংলাদেশী কেবলমাত্র নদীয়া জেলার ঝুপড়িগুলিতে বসবাস করছে।[৮৭] ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের

পরবর্তীকালে যারা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে, তাদের বলা হয় 'নতুন বসবাস-কারী', আর তার পূর্বে যারা এসেছিল, তাদের বলা হয় 'পুরাতন বসবাসকারী'।[৮৮] তাদের মধ্যেই মজুরির পরিমাণ নিয়ে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। নতুন বসবাসকারীরা দৈনিক অল্প মজুরি নিয়েও কাজ করতে সম্মত হওয়ায় পুরাতন বসবাসকারীরা ক্ষোভ প্রকাশ করছে, এমন দৃশ্য সীমান্ত-অঞ্চলে প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। রাস্তার পাশে ও রেলওয়ে লাইনের ধারে অজস্র ঝুপড়িতে অনুপ্রবেশকারী হিন্দু ও মুসলিমকে বাস করতে দেখা যায়। তাদের মধ্যে অধিকাংশই হলো কৃষিজীবী ও কারিগর শ্রেণীর মানুষ।[৮৯]

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সীমান্তের ঠিক ওপারেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনসমষ্টির হার দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। স্বভাবতই বাংলাদেশের সীমান্ত-সংলগ্ন জেলাগুলিতেও সংখ্যাগুরু মুসলিম জনসমষ্টির সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এইভাবে দুই রাষ্ট্রের সীমান্ত জেলাগুলিতে মুসলিম জনসমষ্টির যে-বলয় সৃষ্টি হয়েছে, তাতে জনবিন্যাস ধারণ করেছে এক নতুন রূপ। এখানে একদিকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে যেমন ধর্মীয় মৌল-বাদীরা এবং জামাত-ই-ইসলামি দল প্রভাব বিস্তার করতে সক্রিয় হয়েছে, তেমনি অনুপ্রবেশকারী হিন্দুদের মধ্যেও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ভারতীয় জনতা পার্টি ও অন্যান্য ধর্মীয় মৌলবাদীদের তৎপরতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শুধু সীমান্ত অঞ্চলে নয়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ও কলকাতা শহরে মৌলবাদী হিন্দু ও মুসলিম বৃত্ত দুটির ক্রমবর্ধমান প্রভাব জটিলতার সৃষ্টি করে চলেছে, তার ফলে ধর্মমিশ্রিত রাজনীতির ব্যাপ্তি ঘটছে।[৯০]

(৫) ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রে সেকিউল্যার গণতান্ত্রিক আদর্শ সংরক্ষণের সমস্যা: সাম্প্রতিক-কালের অনুপ্রবেশ-সমস্যা এই অঞ্চলের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনধারায় একটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। অনুপ্রবেশ-সমস্যাটি নিঃসন্দেহে সৃষ্টি করেছে এক ভয়ংকর জটিলতা। বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী সেকিউল্যার-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভাবে প্রশাসনিক যন্ত্র ও মৌলবাদীদের আঘাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের জীবনে নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়েছে এবং তারা তাদের দীর্ঘকালের স্মৃতিবিজড়িত আবাসস্থল ত্যাগ করে ভারতে প্রবেশ করতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রবক্তা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অগ্রসর অংশ তা উপলব্ধি করতে পারেন। প্রশ্ন হলো: ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বাংলাদেশ থেকে এইভাবে চলে

গেলে বাংলাদেশে তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় : (ক) বাংলাদেশে এই অবস্থা চলতে থাকলে রাষ্ট্র তার বহুধর্মীয় চরিত্র হারিয়ে ফেলবে; (খ) ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া ব্যাপ্ত হলে স্বাভাবিকভাবেই অসহিষ্ণুতার পরিবেশ প্রকট হয়ে উঠবে; (গ) গণতান্ত্রিক আন্দোলন নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে এবং মৌলবাদীদের আঘাতে তা হবে বিপর্যস্ত। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রবাহটি বহু ধর্মীয় রাষ্ট্রিক-কাঠামোর প্রেক্ষাপটেই সতেজ হয়েছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত এবং তার পরবর্তীকালের বিভিন্ন পর্যায় বিশ্লেষণ করলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধর্মের নামে যারা ধর্মান্ধতা প্রচার করতে প্রয়াসী হয়, তাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি বারে বারে তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলে ধরেছে। বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারবর্গ ও সহকর্মীদের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পরে এক প্রতিকূল পরিবেশেও এই ধারাটি অব্যাহত রয়েছে।[১১] ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় প্রতিক্রিয়াশীল গ্রুপগুলি তাদের শক্তিকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামীকরণের ঢেউ সমগ্র বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলকে এখন গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় ইসলামের আধ্যাত্মিক নৈতিকতার পরিবর্তে ধর্মান্ধ মৌলবাদী ধ্যান-ধারণাই গুরুত্ব পাচ্ছে। অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠীর জনসাধারণের সঙ্গে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সহজ-স্বাভাবিক সহাবস্থান কেন সম্ভব হচ্ছে না, এই বিষয় নিয়ে ধর্মতত্ত্ববিদদের মধ্যে আলোচনা না হওয়ায় ইসলাম নির্ভর ঔদার্যবোধ ও মানবিকতাবোধের সঙ্গে সাধারণ মানুষ পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না।[১২] বাংলাদেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্ম ইসলামের রয়েছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রকৃত অর্থে ইসলামিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মীয় সংখ্যাগুরু জনসমষ্টি যদি নিজ ধর্মের প্রতি অনুরক্ত থেকে অন্য ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হতে পারে, তাহলে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে; এর ফলে বহু ধর্মীয় রাষ্ট্রিক কাঠামোটিও অটুট থাকবে, অগ্রগতি ঘটবে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে ধর্মতত্ত্বের আলোচনার প্রতি গুরুত্ব না দিলে যারা ধর্মান্ধতাকে অবলম্বন করে ক্ষমতা বজায় রাখার অথবা দখলের চেষ্টা করছে, তাদের বিচ্ছিন্ন ও শক্তিহীন করা সম্ভব হবে না। সুতরাং বর্তমানে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংগঠক ও সমর্থকদের যে প্রশ্নটির জবাব দিতে হবে, তা হচ্ছে : ধর্মীয় মৌলবাদীদের পযুর্দস্ত না করে কি বাংলাদেশে বাহাত্তরের সংবিধানের মৌল আদর্শ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব?[১৩]

বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ধর্মীয় সংখ্যাগুরু জনসমষ্টির অনুপ্রবেশ অব্যাহত গতিতে ঘটতে থাকলে তার কি পরিণতি পশ্চিমবঙ্গে হতে পারে, এবার তা দেখা যাক। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার শাসন-ক্ষমতায় থাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এখানকার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করতে সক্ষম না হলেও, গত দশ বছরে অনুপ্রবেশের ফলে এই রাজ্যের সামাজিক—রাজনৈতিক জীবন যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তাতে সংখ্যাগুরু হিন্দু মৌলবাদী শক্তি নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির পক্ষে অনেকটা অনুকূল পরিবেশই পেয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে সংখ্যালঘু মুসলিম মৌলবাদী শক্তিও আরো সংহত হতে প্রয়াস চালাচ্ছে। এর ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধও প্রবল হচ্ছে। কোনো কোনো জায়গায় তা বিক্ষিপ্তভাবে সম্প্রদায়গত সংঘাতের রূপও ধারণ করছে।[১৪] বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসমষ্টি যাতে অবাধে ভারতে অনুপ্রবেশ করতে পারে, সেজন্য বাংলাদেশের কোনো একটি মহল থেকে 'লেবেনস্রাউম' (Lebensraum) তত্ত্ব প্রচার করা হচ্ছে।[১৫] অন্য আর একটি মহল থেকে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে নিয়ে 'কনফেডারেশন' (Confederation) বা 'মিত্র সংঘ' গঠনের কথাও বলা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পরেই পাকিস্তানের 'কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া-শীল মহল' পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের 'কনফেডারেশন' গঠনের কথা বলতে শুরু করে।[১৬] বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন যখন ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে, ঠিক তখনই আবার প্রচার করা হচ্ছে এই সব তত্ত্ব। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতের সেকিউল্যার মডেলটি আইনের শাসনের মাধ্যমে ভারতের বহুধর্মীয় রাষ্ট্রিক চরিত্রকে অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাম ও গণতান্ত্রিক দলসমূহ এই মডেলটিকে আরো পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতেও তৎপর। অন্যদিকে পাকিস্তানে এবং বাংলাদেশে সেকিউল্যার গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা গড়ে তুলবার জন্য বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলি সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। তারা সেখানকার ধর্মীয় মৌলবাদী দলগুলিকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছে। এই আন্দোলন ফলপ্রসূ হলে পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখে উন্নতির পথে এগুতে পারবে। তাই 'মিত্র সংঘের প্রস্তাব' এবং 'লেবেনস্রাউম তত্ত্বের প্রচার' শুধু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে না, বাংলাদেশের ও পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরও ক্ষতি করছে। মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশের স্বাধীনতার কুড়ি বছর পরেও বাহাত্তরের সংবিধানের মৌল আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য

জনসাধারণের প্রয়াসকে ব্যর্থ করতে ধর্মীয় মৌলবাদীরা বদ্ধপরিকর।[১৭] অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলাগুলিতে যেভাবে বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং সেখানে যদি ধর্মীয় মৌলবাদীরা সংগঠিত হবার সুযোগ পায়, তাহলে ভারতের সেকিউল্যার মডেলটি বিপর্যস্ত হতে পারে, এমন সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করার সত্যিই কোনো কারণ নেই। ভারত ও বাংলাদেশ—এই দুটি পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক অটুট রাখার জন্যই ধর্মীয় মৌলবাদীদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা আজ একান্ত প্রয়োজন। এই কাজ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে শুরু না করলে দু'দেশেরই বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি অদূর ভবিষ্যতে ধর্মীয় মৌলবাদীদের আঘাতের সামনে হয়তো দাঁড়াতে সক্ষম হবে না।

সূত্র-নির্দেশ

১ Amalendu De, *Migration From Bangladesh to West Bengal*, Lecture delivered at the *South and South-East Asian Studies*, Calcutta Uuiversity, on February, 20, 1991; Amalendu De, *Sloping Marks in the Demographic Graph of Religious Minorities in Bangladesh (1974-1990) and its Impact On both Bangladesh and West Bengal*, Paper presented at a Seminar on *Communalism and Casteism in South Asia*, Organised jointly by the Department of *Islamic History & Culture and South and South East Asian Studies*, at the *History Department of Calcutta University*, on April 12, 1992. ২০ ফেব্রুয়ারির সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাইরেক্টর ডঃ জয়ন্তকুমার রায় এবং ১২ এপ্রিলের সেমিনার-অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক হিস্ট্রি এণ্ড কালচার ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান ডঃ সুশীল চৌধুরী।

২ যেসব গ্রন্থের সাহায্যে প্রাক্-১৯৭১ পর্ব রচিত হয়েছে, তা এখানে উল্লেখ করা হলো : *A Hand book of Government Policy and plans for the resettlement of Refugee Population, July, 1948* (Government of West Bengal); *Recurrent Exodus of Minorities from East Pakistan and Disturbances in India—A Report to*

the Indian Commission of Jurists by its Committee of Enquiry, Part I, 1947-1963, New Delhi, Indian Commission of Jurists, 1965 ; Ranajit Roy, *The Agony of West Bengal,* Calcutta, 1971.

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, **উদ্বাস্তু**, কলিকাতা, আগস্ট ১৯৭০ ; Kanti B. Pakrashi, **The uprooted. A Sociological study of the Refugees of West Bengal, Calcutta**, **1971 ;** অমিতাভ গুপ্ত, **পূর্ব পাকিস্তান,** কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ ; Saroj Chakraborty, **My years with Dr. B C. Roy**, Calcutta, June 1982 ; Prafulla K. Chakraborti, **The Marginal Men**, Kalyani, 1990 ; বাপী দে, **পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু-আগমনের কারণ বিশ্লেষণ এবং উদ্ভূত সমস্যা পর্যালোচনা** (১৯৪৭-১৯৫২), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এম. ফিল্ গবেষণাপত্র (অপ্রকাশিত), ক্রমিক সংখ্যা—১০, ১৯৮৬-৮৭। ভারতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর গ্রন্থে পাওয়া যায়। উদ্বাস্তুদের বিষয়ে আলোচনায় এই গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে এক আকর গ্রন্থ।

৩ Stanley Wolpert, **Jinnah of Pakistan**, New Delhi, 1985, p. 339. ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১১ আগস্ট করাচীতে পাকিস্তান কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির সভায় সর্বসম্মতভাবে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পরে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ পাকিস্তানের সংবিধান কি ধরনের হবে সেই বিষয়ে নিজের মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন: "You are free ; you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan... you may belong to any religion or caste or creed—that has nothing to do with the business of the state...We are starting in the days when there is no discrimination, no distinction between one community and another, no discrimination between one caste or creed and another. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. The people of England in course of time had to face the realities of the situation and had to discharge the responsibilities and burdens placed upon them

by the government ..Today, you might say with justice that Roman Catholics and Protestants, do not exist ; what exists now is that every man is a citizen, an equal citizen of Great Britain...all members of the Nation" (Ibid). অর্থাৎ, জিন্নাহ পাকিস্তান রাষ্ট্রে একটি 'Civil Society' স্থাপন করার কথা ভেবেছেন। তিনি অতি দ্রুত সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিবর্তে একটি 'সেকিউল্যার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' গঠনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর ভাষণে এই মনোভাব ব্যক্ত করলেও তিনি কার্যকর কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পশ্চাতে যে দ্বিজাতি তত্ত্বটি ছিল, তার প্রভাবই বজায় থাকে, 'Civil Society'-র আদর্শের পরিবর্তে ইসলাম ধর্মীয় মনোভাবই প্রকট হয়ে ওঠে। তাই পাকিস্তান রাষ্ট্র একটি 'সেকিউল্যার গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্র হিসেবে গঠিত হলো না।

৫ বাপী দে, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৭-৩৩।

৬ Prafulla K Chakraborti, op. cit, p. 1.

৭ Ibid, pp. 2-3.

৮ Ibid, pp. 3, 106-107 ; বাপী দে, ঐ, পৃষ্ঠা ৩৩-৪৫– 'নেহরু-লিয়াকত চুক্তি' এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : **Recurrent Exodus of Minorities From East Pakistan and Disturbances in India—A Report to the Indian Commission of Jurists by its Committee of Enquiry, New Delhi, Indian Commission of Jurists** (Part I, 1947-1963) New Delhi, 1965, pp 1-11, 'নেহরু-লিয়াকত চুক্তি' থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করা হলো : "Shall ensure to the minorities throughout its territories, complete equality of citizenship, irrespective of religion, full sense of security in respect of life, culture, property and personal honour, freedom of movement within each country and freedom of occupation, speech and worship". (Ibid, p. 11), এই চুক্তি **Delhi Pact of 1950** নামেও পরিচিত।

৯ Ibid ; Durga Das Basu, **Introduction to the Constitution of India,** New Delhi, 1987.

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি ভারতে যে নতুন সংবিধান প্রচলিত হয়, তাতে ভারতকে 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করা হয় এবং এই সংবিধান প্রতিটি ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করে এবং ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদির ভিত্তিতে নাগরিকদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করে। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. অমলেন্দু দে, **ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা**, কলিকাতা, ১৯৯২, প্রথম অধ্যায়।

১০ Nim C. Bhowmik, **Legal Lynching & Exodus of Minorities from Bangladesh, in South Asia Forum Quarterly,** vol. 4, No. 4 : Fall, 1991 (Published from U. S. A.). উল্লেখ্য এই, ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

১১ Ibid.

১২ Ibid.

১৩ Ibid.

১৪ Ibid ; মতিউর রহমান ও সৈয়দ আজিজুল হক, **বৈষম্যের শিকার বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়**, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৪-১৫, ৩৪-৪২, ৫৩-৬৪। হিন্দুদের দুরবস্থার চিত্র এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. Debesh Chandra Bhattacharya, **Enemy (Vested) Pr operty Law in Bangladesh Nature and Implications,** Dhaka, 1991.

১৫ Prafulla K. Chakraborti, op. p. 4.

১৬ ডঃ হাসান উজ্জামান, **রাজনৈতিক উন্নয়নে ঐকমত্য এবং বাহাত্তরের সংবিধানে পরিলক্ষিত সম্ভাবনা**, দ্র. **খবরের কাগজ**, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা '৯২, ঢাকা, ২৬ মার্চ, ১৯৯২, সম্পাদক : কাজী শাহেদ আহমেদ। এই সংখ্যায় বাংলাদেশের আরো কয়েকজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ লিখেছেন। তাঁদের প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গত একটি তথ্যের প্রতি বাংলাদেশের গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। পাকিস্তানের কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ও আইনসভার বিবরণসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, কিভাবে সংখ্যালঘু সদস্যরা পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য যুক্ত নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন করেন। এই সব তথ্য অবলম্বন করে কেউ গবেষণা করেছেন কিনা

আমার জানা নেই। (দ্র. প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, পাক-ভারতের রূপরেখা, কলিকাতা, ভাদ্র, ১৩৭৫)

১৭ মতিউর রহমান ও সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ; Prafulla K. Chakrabarti, op. cit., pp 2-5।

১৮ 'Life is not Ours', Land and Human Rights in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh, An up date, of the May 1991 Report, Published by the Chittagong Hill Tracts Commission, March 1992, Copenhagen K. Denmark. Chair-person of this Commsision is Professer Douglas Sanders (Henceforth abbreviated as 'Life is not Ours'), p. 19.

১৯ Ibid.

২০ মেজর রফিকুল ইসলাম, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, ঢাকা, ১৯৮১; Muhammad Ghulam Kabir, **Minority Politics in Bangladesh**, Dacca, 1980.

মেজর রফিকুল ইসলাম তাঁর গ্রন্থে জেনারেল রাও ফরমান আলীর নির্দেশের কথা উল্লেখ করেন। মহম্মদ গোলাম কবিরও তাঁর গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে হিন্দুদের দুরবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন: "In order to crush the nationalist movement, the Pakistan army started a campaign of genocide in Bangladesh on 25 March, 1971. The Hindus in particular were targets of the army. In the first few days of Pakistan army's operations, their targets were the student dormitories, Bengali police and E. P. R. head quarters and the Hindu-populated areas of Dacca. In other cities, too, Hindus became prime targets of the army crackdown. Prominent Hindu politicians, lawyers, doctors, businessmen and teachers, whenever found, were killed by the army. During the entire period of the civil war, they were discriminated against by the Pakistan army. Their houses were burnt, property looted, women raped, and temples destroyed." (Muhammad Ghulam Kabir, op. cit., p. 83).

হিন্দুদের প্রতি পাক সৈন্যদের মনোভাব সম্বন্ধে তথ্যাদি Anthony

Mascarenhas-এর রিপোর্টেও পাওয়া যায়। দ্র. Fazlul Quader Quaderi (Compiled and Edited), **Bangladesh Genocide And World Press**, Dacca, October, 1972, p. 117. অবশ্য পাক সৈন্যরা আওয়ামি লীগ কর্মী ও ছাত্রদের বিদ্রোহী মনে করে তাঁদেরও নির্বিচারে হত্যা করেছে। এই গ্রন্থে প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতার বহু তথ্য পাওয়া যায়।

২১ ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত বাংলাদেশের **সংবিধান** ; ৯, ১০, ১১ ও ১২ অনুচ্ছেদ ; মযহারুল ইসলাম, **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব**, ঢাকা, মার্চ, ১৯৭৪, নবম অধ্যায়। এই বিশাল গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে লেখক 'মুজিববাদ' শব্দ চয়ন করে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা—এই চারটি আদর্শ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। সংবিধানের মৌল আদর্শ সহজ ভাষায় তিনি ব্যাখ্যা করেন। সংবিধান আলোচনার জন্য দ্র. বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, **বাংলাদেশের সংবিধান ও ধর্ম**, দ্র. **বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা**, স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি প্রকাশিত, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১ ৮৯, পৃষ্ঠা ২৫-৩২।

২২ মতিউর রহমান ও সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭। Nim C. Bhowmik, op. cit. ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে **Vested and Non-resident Property Act** ঘোষণা করা হয়।

২৩ T. V. Rajeswar, **Across the Border-II, Census to Avert Communal Friction, in The Statesman**, 7 April, 1990.

এই প্রবন্ধের লেখক টি. ভি. রাজেশ্বর ১৯৮০-৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর প্রাক্তন ডাইরেক্টর এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন গভর্নর। তিনি স্টেটসম্যান কাগজে **Across the Border** শিরোনামায় দুটি প্রবন্ধ লেখেন।

২৪ 'Life is not ours', p. 19.

২৫ Ibid.

২৬ মতিউর রহমান ও সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০, বাংলাদেশের এই দুজন বিশিষ্ট লেখক তাঁদের গ্রন্থে লেখেন : "পার্বত্য চট্টগ্রামের দশকব্যাপী রক্তাক্ত ঘটনাবলীতে বহু উপজাতীয় দেশত্যাগ করেছেন ; এটা ধর্মীয় নয়, তবে এথনিক নিপীড়নের দৃষ্টান্ত"।

২৭ ঐ, পৃষ্ঠা ৪৯

২৮ ঐ, পৃষ্ঠা ৪৯-৫০

২৯ ঐ, পৃষ্ঠা ৫০

৩০ ঐ, পৃষ্ঠা : ৩৪; ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, **ধর্মের নামে নির্বাচন**, **সাপ্তাহিক বিচিত্রা**, ঢাকা, ১১ এপ্রিল, ১৯৯১। বাংলাদেশে ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে তথ্য পাওয়া যায়।

৩১ 'Life is not ours', p. 19.

৩২ Ibid.

৩৩ **বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা**; মতিউর রহমান ও সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫০-৫১

৩৪ **সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ও নিপীড়নের কিছু তথ্য**, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়, **বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ** কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২০মে বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ গঠিত হয়। মনজুরুল আহসান বুলবুল, **হটলাইন বাংলাদেশ : কমিশন ফর জাস্টিস অ্যাণ্ড পীস ; সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহের ওপরে একটি রিপোর্ট**, দ্র. **সংবাদ**, ঢাকা, ৭. ১১. ৯০ ; **গ্লানি (Disgrace)**, ১৯৯১ সালে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত তথ্য, সম্পাদক দেবাশীষ নন্দী, ১৯৯১। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২০মে বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ গঠিত হয়। উল্লেখ্য এই, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতি এরশাদ পরিচালিত সরকার কর্তৃক প্ররোচিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটি রচনা উল্লেখ করছি :

মুনতাসীর মামুন, **সব সম্ভবের দেশে অক্ষমতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা**, দ্র. **একতা**, ঢাকা, ৯. ১১. ৯০ ; মতিউর রহমান, **নিজদেশে পরবাসীদের কথা'**, দ্র. **সংবাদ**, ঢাকা, ১২. ১১. ৯০ ; সৈয়দ বোরহান কবীর, **'সরকারি লোকেরাই হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছে'**, দ্র. **খবরের কাগজ**, ঢাকা, ৮ নভেম্বর, ১৯৯০ ; মালেকা বেগম, **ক্ষমাহীন দাঙ্গা সৃষ্টিকারীরা ক্ষমা পায় কিভাবে?** দ্র. **খবরেরকাগজ**, ঢাকা ৮ নভেম্বর, ১৯৯০। এই দাঙ্গা সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ ২ নভেম্বর, ১৯৯০ একটি সভায় মিলিত হন। বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন, বিচারপতি কে. এম. সোবহান, বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী, ডক্টর কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, অ্যাডভোকেট শামসুল হক চৌধুরী, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম (সদস্য সচিব), অ্যাডভোকেট আলতাফ হোসেন (সভাপতি, ঢাকা আইনজীবী সমিতি),

অ্যাডভোকেট এস. এম. শামসুল ইসলাম (সভাপতি, চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতি) এবং অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী (যুগ্ম-সচিব) হলেন এই গণ-তদন্ত কমিশনের সদস্য। ৪ নভেম্বর, ১৯৯০ এই কমিশনের প্রথম সভা সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ৫৮ পৃষ্ঠার রিপোর্টে কমিশন বাংলাদেশের দাঙ্গার বিষয়ে যেসব তথ্য পরিবেশন করেন তাতে হিন্দুদের দুরবস্থা সম্বন্ধে স্পষ্ট করে ধারণা করা যায়। এই অপ্রকাশিত রিপোর্টকে ৩০-৩১ অক্টোবর, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের দাঙ্গার এক মূল্যবান দলিল হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

৩৫ 'Life is not ours', p. 19.

৩৬ **Bangladesh Population Census, 1981**, p. 74.

৩৭ Ibid.

৩৮ Ibid. pp. 74-75

৩৯ Ibid. pp. 75-76

৪০ Ibid. p. 75

৪১ Bimal Pramanik, **Inter face of Migration and Inter-Religious Community Relations in Bangladesh and Eastern India,** Paper presented by him at a Workshop in Calcutta on May 12, 1990 (Workshop organized by the **Bharat Bangladesh Maitri Samiti**). বিমল প্রামাণিক বাংলাদেশের সেন্সাস রিপোর্ট বিশ্লেষণ করেন। তাঁর এই নিবন্ধটি বাংলায় রচিত। কিন্তু তিনি ইংরেজি শিরোনামাও দেন। আমি এখানে সেভাবেই উল্লেখ করলাম।

৪২ Ibid.

৪৩ আমার রচনার প্রথম পর্বে ভারতে সংখ্যালঘু আগমনের যে-সংখ্যা উল্লেখ করেছি তার সঙ্গে ৩৯ লক্ষ ও ৩৬ লক্ষ যোগ করে এই সংখ্যা পাওয়া যায়।

৪৪ মতিউর রহমান ও সৈয়দ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত; **'Life is not ours'**

৪৫ **'Life is not ours', p. 4.**

৪৬ Ibid. ইত্তেফাক পত্রিকার ফাইল, ১৯৯১ (ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকা); নতুন বাংলা, ঢাকা, ২৭ এপ্রিল, ১৯৯২; আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ মে, ১৯৯২। ১০ এপ্রিল, ১৯৯২ বি. ডি. আর. ও সামরিক

বাহিনীর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে লোগাংয়ের চাকমা 'শান্তিগ্রামে' নারকীয় হত্যাকান্ড হওয়ায় বহুসংখ্যক চাকমা ভারতে প্রবেশ করে। **আনন্দবাজার পত্রিকার** ২০ মে-র সংখ্যায় বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সদ্য ভারতে পালিয়ে আসা চাকমা শরণার্থীদের বিষয়ে খবর প্রকাশিত হয়েছে। ত্রিপুরায় টাকুমবাড়ি শরণার্থী শিবিরের ছবিও বের করা হয়েছে। এই খবরে বলা হয়েছে, "বর্তমানে ভারতে চাকমা শরণার্থীর সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে।" পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সম্বন্ধে আরো তথ্যের জন্য দ্র. অমলেন্দু দে, **পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগোষ্ঠী ও বাংলাদেশ সরকার**), দ্র. **সংবাদ প্রতিদিন**, কলিকাতা, ৪ জুলাই, ১৯৯৩—এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট 'ক'-তে এই প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়েছে।

৪৭ Chitta R. Dutta, **Different Aspects of Discrimination Against Religious Minorities in Bangladesh, in South Asia Forum Quarterly**, Vol 4, No 4 : Fall 1991. ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ১৮-২০ অক্টোবর লণ্ডনে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে চিত্তরঞ্জন দত্ত ও নিমচন্দ্র ভৌমিক দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। নিমচন্দ্র ভৌমিকের কথা আগেই বলা হয়েছে। চিত্তরঞ্জন দত্ত হলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে তাঁর অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'বীর উত্তম' (**Bir Uttam**) উপাধি প্রদান করে। তাঁর রচিত প্রবন্ধ থেকে অনেক তথ্য এখানে উল্লেখ করা হলো।

৪৮ Ibid.

৪৯ Ibid.

৫০ Ibid.

৫১ Ibid.

৫২ Ibid.

৫৩ Ibid.

৫৪ Ibid.

৫৫ Ibid.

৫৬ Ibid.

৫৭ Ibid.

৫৮ Ibid.

৫৯ Ibid.

৬০ Ibid.

৬১ **The Holy Quran,** Text, Translation and Commentary, by Abdullah Yusuf Ali, New Revised Edition, U. S. A., 1989 ; **Al-Hadis,** an English translation and Commentary with vowel-pointed Arabic text or **Mishkat-ul-Massabib** (being a collection of the most authentic sayings and doings of Prophet Muhammad), ed. by Fazlul Karim, Calcutta, 1938-1940, 4 vols (Henceforth abbreviated as Al-Hadis) ; Ameer Ali, Syed, **The Spirit of Islam, London,** 1952, pp. 58-59. ইসলামের মৌল আদর্শের জন্য দ্র. এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ। উল্লেখ্য এই, হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত 'মদিনা সনদের' মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবিকতার উপাদান পাওয়া যায়। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় আসার পরেই হজরত মহম্মদ এই সনদ প্রদান করেন। এই দলিল ইবনে হিশাম তাঁর গ্রন্থের পাতায় সংরক্ষণ করেন। এই সনদ অনুযায়ী মদিনার ইহুদীরাও মুসলমানদের মতো স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মপালন করার অধিকার পায়। তারাও নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করে। বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের বনিয়াদের ওপরে হজরত মহম্মদ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করতে প্রয়াসী হন। স্বভাবতই এই ব্যবস্থায় ইসলাম ও অন্য ধর্মগোষ্ঠীদের সহাবস্থানের বিষয়টি অপরিসীম গুরুত্ব লাভ করে (দ্র. Ameer Ali, Syed, op. cit. ; হজরত মহম্মদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, উদার, মানবিক ও যুক্তিশীল মনন পর্যালোচনার ও তাঁর অমূল্য বাণীসমূহ সম্বন্ধে ধারণা করার জন্য দ্র. পবিত্র গ্রন্থ **Al-Hadis**)

৬২ Chitta R. Dutta, op. cit. ; আবদুল হক ফরিদী, **মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ,** বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ৮২। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা কমিটি নিয়োজিত হয়। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে 'ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় আইন' পাশ করা হয়।

৬৩ মু. সেকেন্দার আলী, **দাখিল ইসলামী পৌরনীতি** [নবম-দশম শ্রেণী], ঢাকা, ১৯৮৯ [প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৫], বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক নবম-দশম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত, পত্র নং পাঠ্য / ৫৩১, এস-৪ তারিখ ৩-১২-৮৪। দশটি অধ্যায়ে লিখিত এই গ্রন্থে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও

কার্যাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে : "ইসলামের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা, শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিকদের মন-মগজ ও মানসিকতা এবং স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণকে ইসলামী পথে নিয়ন্ত্রণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের অত্যাবশ্যক কাজ। এখানেই শেষ নয়, ইসলামী আদর্শের বিকাশ দান ও তা অনুসন্ধান করে চলার পথে যত প্রকার বাধা ও প্রতিবন্ধকতা হতে পারে তা দূর করা, ইসলাম-বিরোধী চিন্তা, সমাজ ও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় মতের প্রতিরোধ করাও ইসলামী রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম" (দ্র. পৃ. ৩৭)। এই ধরনের বহু উদ্ধৃতি এই গ্রন্থের ২০০ পৃষ্ঠা থেকে দেওয়া যায়। ইতিহাস বিষয়ক যেসব গ্রন্থ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত, তাতেও ইসলামের ইতিহাসের ওপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি গ্রন্থ উল্লেখ করা হলো : (১) **সমাজ বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ**, ষষ্ঠ শ্রেণী, ঢাকা, ১৯৮৮ ; (২) **সমাজ বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ**, ৭ম শ্রেণী, ঢাকা, ১৯৮৭ ; (৩) **সমাজ বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ**, অষ্টম শ্রেণী, ঢাকা, ১৯৮৮ ; (৪) **বাংলাদেশের ইতিহাস**, নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য, ঢাকা, ১৯৮৪। তাতে ভারতীয় ইতিহাসের পারস্পরিক সমাদর ও সদৃশকরণের উপাদানগুলি অবহেলিত হয়।

৬৪ মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীর বিষয়ে বিস্তৃত তথ্যের জন্য দ্র. (১) **বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড**, ঢাকা, কারিকুলাম এন্ড টেক্সট বুক উইং, এবতেদায়ী প্রথম শ্রেণী হইতে দাখিলা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত **পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী**, ১৯৮৬-১৯৮৭ ; (২) **বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড**, ঢাকা, কারিকুলাম এন্ড টেক্সট বুক উইং, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী, দাখিল পরীক্ষা, ১৯৮৮-৮৯ ও ১৯৯০ ; (৩) **বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড**, কর্তৃক ঘোষিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী, আলেম পরীক্ষা, ১৯৯০ ও ১৯৯১ ; আরো তথ্যের জন্য দ্র. আবদুল হক ফরিদী, **মাদ্রাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ৭০-৭৫, ৮৪-৮৫

৬৫ আবদুল হক ফরিদী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৬-৮০

৬৬ ঐ, পৃষ্ঠা ৮৬ ৮৭। মাদ্রাসায় কত সংখ্যক ছাত্র শিক্ষালাভ করছে, কতজন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন এবং কত সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার বিশদ বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

(ক) এখানে এই গ্রন্থ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার তুলনামূলক পরিসংখ্যান, ১৯৮০-৮৩ পর্যন্ত পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো :

মাদ্রাসা শিক্ষার তুলনামূলক পরিসংখ্যান

স্তর	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			শিক্ষকদের সংখ্যা			ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা		
	১৯৮০-৮১	১৯৮১ ৮২ (সাময়িক)	১৯৮২-৮৩	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২ (সাময়িক)	১৯৮২-৮৩	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২ (সাময়িক)	১৯৮২-৮৩
দাখিল	১,৪২৬	১,৫০২	১,৩৬১	১০,৭৯৭	১১,০১৬	১১,৯১০	১,৩১,২১০	১,৪০,২০০	২০০,৭৫৩
আলিম	৪৭৭	৪৯৪	৪৩২	৬,০০১	৮,৫০২	৫,২১৮	৮১,৫৫০	৮৩.৩৫০	৭৯,৮২৬
ফাজিল	৫৯৬	৫৯৬	৫৭৫	৮,৭৪৮	৮,৭৪৮	৮,১৫২	১,৩২,৩১২	১,০৬,০০০	১,২৭ ১৭০
কামিল	৬৩	৬৫	৬২	১,৩১২	১,৩১২	১,৩৮২	১৮,৩৯৬	১৮,৫০০	২২,৩১২
মোট	২,৫৬২	২,৬৫৭	২,৪৫০	২৬.৮৫৮	২৯,৬০৮	২৬ ৬৬২	৩,৬৩,৪৬৮	৩,৪৮,০৫০	৪,৩০,০৬১

দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসায় শিক্ষক ছাত্রের আনুপাতিক হার যথাক্রমে ১ : ১৭, ১ : ১৫, ১ : ১৬ এবং ১ : ১৬

(খ) মাদ্রাসা শিক্ষার (ফাজিল ও কামিল) ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক চিত্র :

Year & Type	Number of Institutions	Number of Teachers Total	Number of Teachers Female	Number of Students Total	Number of Students Girls
Fazil					
1980	596	7324	4	132000	4966
1981	586	7845	5	122312	5113
1982	592	8748	7	136000	5688
1983	591	7908	7	148986	5688
1984*	594 (15)	8149	8	153524	5862
1985	615 (17)	11883	10	155036	5919
Kamil					
1980	56	1075		17366	481
1981	56	1095		17390	492
1982	60	1185		18500	506
1983	61	1195		24987	506
1984*	67 (6)	1308		27301	557
1985**	69	1556		28345	592

Note : * Figures in parenthesis indicates number of provisionally permitted institutions. **Including two Government Kamil Madrasahs.

এখানে আবদুল হক ফরিদী যে পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করেন, তার মধ্যে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রকৃত আলেমদের ভূমিকা কিভাবে গৌণ হয়ে পড়ছে, সেবিষয়েও বাংলাদেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের রচনা পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা হলো : আবু জাফর শামসুদ্দীন, **প্রগতিবাদী আন্দোলনের ধারায় আলেম সমাজ**, দ্র. **বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা**, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১৮-২৪।

এই প্রবন্ধে লেখক বলেন : "ওরা সরকারি অনুমোদন ও অর্থ সাহায্যে ইসলামী শিক্ষার নামে প্রকৃতপক্ষে মূর্খতা ও গোমরাহি প্রচারের বিশেষ

উদ্দেশ্যে পল্লীঅঞ্চলে এবং শহরেও ব্যাপকভাবে বিশেষ নামের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে চলেছে। বাংলার মুসলমানসমাজকে মধ্যযুগের গোমরাহিতে নিমজ্জিত" করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এখানে লেখক 'মওদুদী জামাতে ইসলামী' ও 'অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের' ভূমিকা আলোচনায় 'ওরা' শব্দ চয়ন করেন। তিনি দুঃখ করে এই কথাও বলেন, "দেওবন্দে মতাদর্শে বিশ্বাসী দেশের প্রকৃত আলেমগণ একটি সংঘবদ্ধ শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ" করতে না পারার জন্য ইসলাম ধর্মচর্চার মওদুদীর জামাতে ইসলামীর প্রাধান্য বজায় থাকছে (ঐ, পৃষ্ঠা ২২-২৪)। আর একটি প্রবন্ধও উল্লেখ্য: মাওলানা আবদুল আওয়াল, **জামাতে ইসলামীর ধর্মব্যবসা**, দ্র. **বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা**, পৃষ্ঠা ৪৬-৫৪।

৬৭ **বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা**, দ্র. এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধ ; ডঃ কামাল হোসেন, **একটি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই গণতান্ত্রিক ফোরাম গঠনের লক্ষ্য**, দ্র. **অধুনা**, সম্পাদক মাহবুব-উল-করিম, ঢাকা, বর্ষ ১, সংখ্যা ৬ মার্চ, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৬-১২। ডঃ কামাল হোসেন বাংলাদেশে 'আইনের শাসন' প্রতিষ্ঠা করার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন : "আইনের শাসনের মাধ্যমেই কেবল উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্য আইনের শাসনই পূর্ব শর্ত" (ঐ, পৃষ্ঠা ১০)। বাংলাদেশে আইনের শাসন যে নেই, তা তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা করতে আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনা সহায়ক। তার জন্য দ্র. **খবরের কাগজ, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা** '৯২, ২৬ মার্চ, ১৯৯২।

৬৮ Chitta R. Dutta. op. cit.

৬৯ **Asa**, Published by **Voluntary Health Services Society**, September, 1990.

৭০ Census Reports of 1951, 1961, and 1971 ; বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. অমলেন্দু দে, **ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা**, কলিকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯২, দ্বিতীয় অধ্যায়।

৭১ Census Reports of 1971 and 1981 ; Also See for analytical study T. V. Rajeswar, **Across the Border—1, Serious Influx from Bangladesh, in The Statesman**, April 6, 1990.

৭২ পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট সরকার, নয় বছর, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, ২১ জুন, ১৯৮৬।

৭৩ T. V. Rajeswar, op. cit. এখানে মুদ্রণ-ত্রুটির জন্য মুর্শিদাবাদের মুসলিম জনসংখ্যা ৬৯% উল্লেখিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু টি. ভি. রাজেশ্বর লিখিত প্রবন্ধের প্রথম অংশ পড়ে যে মন্তব্য করেন, তা এখানে উদ্ধৃত করা হলো : **Statesman (April 7, 1990)** পত্রিকার **Staff Reporter** লেখেন : "Reacting to the first part of Mr. T. V. Rajeswar's article, which we published yesterday, Mr. Jyoti Basu issued a statement in Writers' Buildings on Friday saying that the former Governor of West Bengal had based his conclusions on "wrong and unwarranted assumptions." The statement said : "It would have been better if he had tried to base his article on correct facts and figures."

"Referring to the report the Chief Minister pointed out that Mr. Rajeswar's figure of the Muslim population in the districts (between 31 per cent and 69 per cent) was incorrect and not based on facts. It is a fact that the population in some border districts had gone up more compared to the state average. This was inter alia owing to the fact that some border districts had influx from Bangladesh which comprised both the Hindus and Muslims. This was evident from the figures of infiltrators across the border from Bangladesh who had been pushed back and on local information.

"This only goes to show that Mr. Rajeswar has based his conclusions on wrong and unwarranted assumptions." Mr. Basu stated the problem of the influx had been engaging the attention of the State Government for quite some time. The State Government had suggested certain measures to control this problem like sanction of additional staff for the Mobile Task Force and introduction of restrictions on

Bangladesh nationals who visited India, the statement added."
—Staff Reporter.

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বিবৃতির উত্তরে টি. ভি. রাজেশ্বর বলেন: "I wish Mr. Jyoti Basu had waited for the second and concluding part of my article on the influx from Bangladesh. After my tour in the North Bengal Districts in May 1989, I had written a letter to Mr. Jyoti Basu on June 5 drawing his attention to this serious problem. The exact figures of Muslim percentage of the population, mentioned in that letter were 30·97 per cent from Birbhum; 35·79 percent for West Dinajpur; 45·27 percent for Malda; and 5ৎ·66 percent for Murshidabad, as per the figures published in the 1981 Census. (The figure of 69 percent for Murshidabad published in the first part of my article was a printing error by The Statesman).

"I had also mentioned that the decadal growth rate of the Muslim population in West Bengal, as per the 1981 Census, was 29·6 percent, while the overall growth rate for the State was 23·2 percent. I had also cautioned in that letter against the issue of identity cards in the border districts without a proper Census, as it might result in legalizing a large number of Bangladesi infiltrants. Mr. Jyoti Basu may kindly refer to this letter and also see the 1981 census report as well as the handbook of statistics publised by the state.

"I submit that there are no wrong or unwarranted assumptions in my article, nor was it intended to embarrss the State Government. An impartial reading of the article will show that its purpose was to put forth the problem in proper perspective, so that the necessary remedial measures could be taken."

৭৪ Ibid. Also see Census Report of 1981.

৭৫ Ibid.

৭৬ Sanjoy Hazarika, **Between 10 and 14 million migrants have settled in this country Bangladeshisation of India**, in **The Telegraph**, Calcutta, February 6, 1992 ; Swapan Das Gupta, **Politics of Infiltration Lebonisation of eastern India should be adverted at all costs,** in Sunday, March 22-29, 1992. Sanjoy Hazarika's article is based on a study commissioned by the American Academy of Arts and Sciences, Harvard and Toronto Universities. Sanjoy Hazarika is a reporter for The New York Times. সঞ্জয় হাজারিকা তাঁর সংগৃহীত তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্ত করেন : "not less than 10 to 14 million migrants and their descendants have over all settled in India." সেন্টার ফর সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের অধ্যাপক শান্তিময় রায়ের মতে, গত এক দশকে ১০ মিলিয়ন বাংলাদেশী ভারতকে তাদের আবাসস্থল করেছে। স্বপন দাশগুপ্ত তাঁর প্রবন্ধে এইসব তথ্য উদ্ধৃত করেন। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে স্বপন দাশগুপ্ত লেখেন : "Jyoti Basu has written on numerous occasions to Delhi to find a way out. 'We are not a dharmasala', he once told the press". (দ্র. Ibid)।

৭৭ Ibid.

৭৮ Ibid. এম. এম. জেকব যে তথ্য সরবরাহ করেন তার সম্বন্ধে স্বপন দাশগুপ্ত মন্তব্য করেন : "But official statistics underestimate the problem to the point of absurdity" (Ibid).

৭৯ Ibid.

৮০ Ibid. T. V. Rajeswar, **Across the Border—I,** op. cit.

৮১ T. V. Rajeswar, **Across the Border—II,** op. cit.

৮২ Ibid. তাপস সিংহ, **অনুপ্রবেশ**, দ্র. **আনন্দবাজার পত্রিকা**, বুধবার ২৭ মার্চ, ১৯৯১। তাপস সিংহ বিশদভাবে এই সমস্যা আলোচনা করেন। তিনি লেখেন : "সরকারি জনগণনার হিসাব অনুসারে, '৭১ থেকে '৮১-র মধ্যে রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২২.৯ ভাগ। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তুলনা করে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু '৮৬-র ২২ মার্চ রাজ্য বিধানসভায় বলেছিলেন, সীমান্তবর্তী পশ্চিম দিনাজপুর জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৯ শতাংশ এবং নদীয়া জেলার

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩৩ শতাংশ। অথচ হাওড়া বা বাঁকুড়ায় এই বৃদ্ধির হার ২০'২২ শতাংশ।

"বেসরকারি সূত্রে পাওয়া একটি হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র কলকাতা শহরেই অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ১০ লক্ষ। সীমান্তবর্তী ন'টি জেলা, যেমন মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক। ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের (মিনিস্ট্রি অব এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্স) একটি সমীক্ষার রিপোর্টেও একথা বলা হয়েছে। নদীয়া জেলার একটি হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে, '৮১-তে নদীয়ার লোকসংখ্যা ছিল ২৯ লক্ষ ৭৭ হাজার। অথচ অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবেই '৮২-তে নদীয়া জেলাতে রেশন কার্ড ইস্যু করা হয় ৪৪ লক্ষ।

"যেমন, কলকাতার গার্ডেনরিচ অঞ্চলে '৮৮-তে রেশন কার্ড ইস্যু করা হয় ৩ লক্ষ ১২ হাজার। অথচ '৮৭-তেই এলাকার ভোটারের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৫০০ জন। শিয়ালদহ বিধানসভা কেন্দ্রে '৮৭-র ভোটার তালিকা অনুযায়ী ভোটারের সংখ্যা ছিল ৭৫ হাজার। কিন্তু '৮৮-র নভেম্বর পর্যন্ত রেশন কার্ড দেওয়া হয় ১ লক্ষ ৯০ হাজার। উল্লেখ্য, শিয়ালদহ কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে রাজাবাজারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলও, যা অনুপ্রবেশকারীদের 'নিরাপদ আশ্রয়স্থল' হিসাবে পরিচিত। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বেলগাছিয়া পূর্ব ও পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র মিলে ভোটারের সংখ্যা ৩ লক্ষ ১৪ হাজার। অথচ '৮৮-র নভেম্বর পর্যন্ত ওই দুটি কেন্দ্রে মোট রেশন কার্ড ইস্যু করা হয়েছে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো, কেন এই বিপুল হারে রেশন কার্ড ইস্যু করা হলো, তা নিয়ে রাজ্য সরকার একবারও খাদ্য দফতরের কাছে কৈফিয়ত তলব করলেন না। গোয়েন্দা দফতর একবারও তদন্ত করে দেখল না, কেন এবং কাদের সুপারিশে রেশনিং অফিস লক্ষ লক্ষ রেশন কার্ড ইস্যু করছে?" (দ্র. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ মার্চ, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ১)।

৮৩ **The Statesman, April, 1989.**

৮৪ Ibid.

৮৫ Ibid. December, 1989. ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা মুরলী মনোহর যোশী তাঁর বিবৃতিতে এই কথা বলেন। ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কর্নেল সব্যসাচী বাগচী (অবসরপ্রাপ্ত)

বলেন, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৫ লক্ষেরও বেশি বাংলাদেশী ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে (দ্র. The Statesman, February 17, 1991)।

ভারতীয় জনতা পার্টির ভাইস-প্রেসিডেন্ট সিকন্দর বখত বলেন, ভারতে অস্বাভাবিক অনুপ্রবেশ ঘটছে। অনুপ্রবেশকারীদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হোক। তিনি বলেন, 'অনুপ্রবেশ মহাপ্লাবনের রূপ ধারণ করেছে' ('taking the shape of a deluge'), See **The Statesman**, February 18, 1991.

৮৬ **The Statesman,** February 13, 1991. পাকিস্তানের Muhajir Qaumi Movement-এর সঙ্গে বাংলাদেশ মোহাজির সংঘের কোনো যোগাযোগ রয়েছে কিনা, সে বিষয়ে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না (Ibid)। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত (২৭ মার্চ, ১৯৯১) তথ্য থেকে জানা যায়, রইসউদ্দিন বিশ্বাস হলেন বাংলাদেশ মোহাজির সংঘের সভাপতি। মোহাজিররা ভারতের নাগরিকত্ব দাবি করে।

৮৭ Paper Presented by Manik Sen at a Workshop organised by **Bharat Bangladesh Maitri Samiti** at Calcutta on May 12, 1990. মানিক সেন নিজে সমীক্ষা করে যেসব তথ্য পেয়েছেন তার ভিত্তিতেই বলেন।

৮৮ Ibid.

৮৯ Ibid. আরো তথ্যের জন্য দ্র. তাপস সিংহ, **অনুপ্রবেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা**, ২৭ মার্চ, ১৯৯১।

৯০ Ananta Kumar, **Infiltration from Bangladesh In 1988.** Ananta Kumar visited different parts of West Bengal and collected valuable materials on this subject. An unpublished document.

৯১ বদরুল আলম খান (সম্পাদক) **বাংলাদেশ : ধর্ম ও সমাজ,** সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ, চট্টগ্রাম, জানুয়ারি, ১৯৮৮ ; **বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা ; খবরের কাগজ,** ২৬ মার্চ, ১৯৯২—বিভিন্ন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। বদরুল আলম খান 'সম্পাদকের কথা' অংশে লেখেন : "গ্রামীণ সমাজ ধর্মের যে পবিত্র রূপ লালন করে, তাকে অপবিত্র করছে ধর্ম ব্যবসায়ীগণ, শোষকের স্বার্থ রক্ষার কারণে" (দ্র. বাংলাদেশ : ধর্ম ও সমাজ)

৯২ বদরুল আলম খান (সম্পাদক), প্রাগুক্ত ; মাওলানা আবদুল

আওয়াল, **জামাতে ইসলামীর ধর্মব্যবসা**, দ্র. **বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা**। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামিক ও সেকিউল্যার উপাদান সম্বন্ধে আনিসুজ্জামান, তালুকদার মনিরুজ্জামান, রাজিয়া আকতার বানু, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, সাখাওয়াত আলী, বদরুল আলম খান, এম. এম. আকাশ, ভূঁইয়া মনোয়ার কবীর, বদরুদ্দীন উমর, আহমদ শরীফ, হাসানউজ্জামান প্রমুখ লেখকেরা আলোচনা করলেও, ধর্মতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থসমূহে প্রকৃত ধর্মতত্ত্বমূলক আলোচনার অভাব থাকায় বাংলাদেশের অগণিত সাধারণ মানুষ ধর্মীয় মৌলবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত অসংখ্য গ্রন্থ ও বিভিন্ন 'তফসীর' বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এইসব গ্রন্থের লেখকেরা কতটা ধ্রুপদী যুগের ইসলাম এবং ইসলামের মৌল আদর্শ যথার্থভাবে ব্যক্ত করতে সক্ষম হন।

বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী দল বাংলাদেশে 'ইসলামী রাষ্ট্র' স্থাপনের যে আন্দোলন করে, তাও লক্ষণীয়। গত এক দশকে এই দলের পক্ষ থেকে বহু পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে 'ইসলামী বাংলাদেশ' গঠনের বিষয় গুরুত্ব পায়। জামায়াতে ইসলামী নেতা আমীর গোলাম আযম অনেকগুলি পুস্তিকা লেখেন। তার মধ্যে কুড়িটি পুস্তিকা পড়বার আমার সুযোগ হয়েছে। তিনি ইসলামী বাংলায় কেন বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মের সঙ্গে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ধর্মসমূহের সহাবস্থান হচ্ছে না, এই প্রশ্নটি সযত্নে পরিহার করেছেন। তাঁর রচিত 'সংক্ষিপ্ত তফসীর' পুস্তিকায় বা অন্য পুস্তিকায় ইসলামের ঔদার্যবোধ, মানবিকতা, সহনশীলতা, নারীদের প্রতি সম্ভ্রমবোধ ইত্যাদি গুণগুলি এমন গুরুত্ব পায়নি, যাতে বাংলাদেশে বহুধর্মীয় রাষ্ট্রিক চরিত্রটি সুদৃঢ় হতে পারে। তাঁর লিখিত কয়েকটি গ্রন্থের কথা এখানে উল্লেখ করছি: **বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী**, ঢাকা, মার্চ, ১৯৮৭; **ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য ও বিভ্রান্তি**, ঢাকা, ১৯৮৩; **ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন; ইকামাতে দ্বীন; জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য; ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ; গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী; ইসলামী বিপ্লবের পথে; অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী**, ঢাকা, ১৯৮৪; **বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী**।

৯৩ হাসানউজ্জামান, **রাজনৈতিক উন্নয়নে ঐকমত্য এবং বাহাত্তরের সংবিধানে পরিলক্ষিত সম্ভাবনা**, দ্র. **খবরের কাগজ**,

২৬ মার্চ, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৬-৪০। জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে 'ইসলামী হুকুমাত' কায়েম করা। এই দল ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্রবাদ, পশ্চিমী গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা ইত্যাদির বিরোধী। গোলাম আযম লেখেন : "যদি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলে, তাহলে ভারতের আধিপত্য থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনও উপায় থাকবে না। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু না হলে রাশিয়ার পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে এদেশটি রাশিয়ার খপ্পরে পড়ারই প্রবল আশংকা আছে।" (দ্র. বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও জামায়াতে ইসলামী, পৃ: ৩১-৫৩)। কিভাবে জামায়াতে ইসলামী দল গ্রামাঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তার করে, সেসম্পর্কে গোলাম আযম লেখেন : "মসজিদসমূহকে সংগঠিত করার মাধ্যমে সাধারণ মুসল্লীগণকেও ইসলামী দাওয়াতের আওতায় আনা যাচ্ছে। ইমাম ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে বাংলাদেশ মসজিদ মিশন ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত পল্লীঅঞ্চলেও জনগণের মধ্যে পেঁছাবার ব্যবস্থা করেছে"। (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫)

৯৪ পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত দৈনিক পত্র-পত্রিকায় এই বিষয়ে বহু তথ্য প্রকাশিত হয়।

৯৫ Sadeq Khan, **State-bound nationalism and development efforts-II. The question of Lebensraum.** in Holiday, Dhaka, 18. 10. 91 ; পবিত্রকুমার ঘোষ, **বাংলাদেশিদের বাসভূমির দাবি, ইতিহাসের পটে সাম্প্রতিক,** দ্র. বর্তমান, নভেম্বর ২৮, ১৯৯১ ; Sunday, March 22-29, 1992, স্বপনকুমার দাশগুপ্ত অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে লেখেন : "The long term threats posed by this human wave, a part of what a Bangladeshi writer has justfied as the 'question of Lebensraum' is not unknown to either the State or the Central Government." (Vide Sunday, op. cit). 'লেবেনস্রাউম' শব্দটি জার্মান। হিটলার জার্মানদের জন্য বৃহত্তর বাসভূমির দাবি উত্থাপন করেন। তখন তিনি 'লেবেনস্রাউম' স্লোগান আউড়ে যুদ্ধের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেন। উল্লেখ্য এই, ঢাকার ইংরেজি সাপ্তাহিক 'হলিডে' পত্রিকায় বাংলাদেশীদের জন্য বৃহত্তর বাসভূমির দাবিটিকে রূপদানের উদ্দেশ্যে 'লেবেনস্রাউম' প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এখানে উল্লিখিত সাদেক খান লিখিত প্রবন্ধটি পড়লেই বোঝা যায়, কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই তত্ত্ব প্রচার করা হচ্ছে (দ্র. Sadeq Khan, op. cit).

৯৬ মতিউর রহমান, **মুসলিম লীগের 'পাকিস্তানী ঘোর' এবং**

খাজা খায়েরের আসা-যাওয়া, দ্র. **সংবাদ**, ঢাকা, সোমবার, ২৯ আশ্বিন, ১৩৯৭। পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি খাজা খায়েরউদ্দিন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই পাকিস্তানে বসবাস করেন। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পরে তিনি কয়েকবার ঢাকায় আসা-যাওয়া করেন। তিনি বাংলাদেশের মুসলিম লীগের তিনটি গ্রুপের সাথে মিলিত হয়ে পুনরায় একটি দলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাবের আগে কাউন্সিল মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন ঢাকার খাজা খায়েরউদ্দিন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চের হত্যাকাণ্ডের পরে ১০ এপ্রিল টিক্কা খানের উদ্যোগে ঢাকায় ১৪০ সদস্যের 'শান্তি কমিটি' গঠন করা হয়। তার আহ্বায়ক ছিলেন খাজা খায়েরউদ্দিন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে তিনি পাকিস্তানে চলে যান। এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ঢাকায় আসা-যাওয়া করতে শুরু করেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব আগা শাহী ঢাকায় এসে 'আনুষ্ঠানিকভাবেই দু'দেশের মধ্যে কনফেডারেশনের প্রস্তাব' দেন। কিন্তু সে আলোচনা আর এগোয়নি। (দ্র. মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত)। বর্তমানে ভারতেও কোনও কোনও মহলে এই 'কনফেডারেশন' গঠনের বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে।

৯৭ ঐ। মতিউর রহমান লেখেন : "বলা হতে পারে যে, একাত্তরের এই পরাজিত শক্তির কোনও ভবিষ্যৎ নেই। কিন্তু দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে দেশকে আরও দক্ষিণে, আরও প্রতিক্রিয়ার দিকে ঠেলে দেওয়ার অপচেষ্টাকে খাটো করে দেখারও উপায় নেই বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী শক্তির" (দ্র. ঐ)। বিস্তৃত বিশ্লেষণের জন্য দ্র. হাসানউজ্জামান, **রাজনৈতিক উন্নয়নে ঐকমত্য এবং বাহাত্তরের সংবিধানে পরিলক্ষিত সম্ভাবনা** (দ্র. প্রাগুক্ত)। বাংলাদেশের জামায়েতে ইসলামীর আমীর গোলাম আযমও স্পষ্ট করে বাহাত্তরের সংবিধানের বিরুদ্ধে তাঁর মত ব্যক্ত করেন (দ্র. **ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য ও বিভ্রান্তি**, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ২৪-২৫)। গোলাম আজম 'ইসলামী নেতৃত্ব সৃষ্টি' করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন, যাতে বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে তিনি জামায়েতে ইসলামী দলকে একটি সুশৃংখল 'ক্যাডার ভিত্তিক' দলে পরিণত করেন (ঐ. পৃষ্ঠা ২৭)।

অনুপ্রবেশ : উত্তর-পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশ

সাম্প্রতিককালে এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিশিষ্ট লেখকদের রচনা প্রকাশিত হচ্ছে। স্বভাবতই এই বিষয়ের প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। কোনও কোনও প্রশ্নে বিতর্কেরও সূচনা হয়েছে।[১] তারই সূত্র ধরে এখানে বিষয়টি আলোচনা করার প্রয়াস করেছি। প্রাসঙ্গিক যেসব তথ্য সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে, তাকে অবলম্বন করেই এই নিবন্ধটি লিখেছি। ভারতের ও বাংলাদেশের সেন্সাস রিপোর্টসমূহ ব্যবহার করতে হয়েছে বলে সেন্সাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। কোনও সেন্সাসই শতকরা একশত ভাগ সত্য বলে ভাববার কোনও কারণ নেই। এমন কি আমেরিকার মতো উন্নত দেশের ক্ষেত্রেও তা সত্যি। ভারতের সেন্সাস-কর্তৃপক্ষও এমন দাবি করেননি যে, তাঁদের সেন্সাস রিপোর্ট একশত ভাগ সত্য। সেন্সাসের তথ্যসমূহ ঠিক আছে কিনা, তার জন্য প্রত্যেক দেশই সেন্সাস-পরবর্তীকালে গণনামূলক পরীক্ষা করে ত্রুটি সংশোধন করে। সেন্সাস-পরবর্তীকালের গণনামূলক পরীক্ষার সঙ্গে সেন্সাস রিপোর্টের সামঞ্জস্য-সাধনের অভাবে কিছু ভুল যে ভারতের সেন্সাসে থেকে যায়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আবার কোনও কোনও সময়ের সেন্সাস রিপোর্ট নিয়ে বিতর্কও দেখা যায়। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি করে দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগও শোনা যায়। আর যে-পদ্ধতিতে সেন্সাস পরিচালিত হয়, তা থেকে কখনই নির্দিষ্ট করে জানা সম্ভব নয়, কারা এই দেশের স্থায়ী বাসিন্দা অথবা কারা বাইরে থেকে এসেছে। সেন্সাস থেকে নাম, জন্মস্থান, বয়স ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা হয়। যাতে কোনও অসুবিধায় পড়তে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিরা এইসব তথ্য দেয়। একই ভাষা-ভাষী হলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া সহজও হয়। একই ভাষার সঙ্গে যদি একই ধর্ম হয়, তাহলে তো সহজেই মিশে যাওয়া যায়। ভিন্ন দেশ থেকে আগত ব্যক্তিরা ভোটের অধিকার, রেশন কার্ড ও সম্পত্তির দলিল পেলে তাদের 'বিদেশী' বলে চিহ্নিত করা আরও কষ্টকর হয়। তাছাড়া ভারতে 'অনুপ্রবেশ সমস্যা' বিষয়ক

আলোচনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা-মানচিত্রের দিকেও তাকাতে হয়। অবশ্য বাংলাদেশের সেন্সাস রিপোর্টসমূহ যে ত্রুটিমুক্ত, তাও বলা সম্ভব নয়। তাসত্ত্বেও আমাদের সেন্সাস রিপোর্ট অবলম্বন করে চলতে হয়। তার সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যান্য সরকারি ও বে-সরকারি সূত্রগুলি যুক্ত করলে জনসংখ্যা মানচিত্রের ছবিটি অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ (আগের পূর্ব-পাকিস্তান এবং তারও আগে পূর্ববঙ্গ) থেকে কত সংখ্যক ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষ ভারতে এসেছে তার একটি হিসেব পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু শিবিরগুলি ও সরকারি পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু তার পরবর্তীকালে ওখান থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ধর্মীয় সংখ্যাগুরুদের যে ভারতে আগমন ঘটে, সে বিষয়ে স্বচ্ছ চিত্র কেবলমাত্র সরকারি তথ্য থেকে পাওয়া যায় না। তাই বাংলাদেশীদের ভারতে প্রবেশ করার বিষয়ে নতুন করে তথ্য অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাছাড়া বাংলাদেশের সেন্সাস রিপোর্ট, শিবিরে বসবাসকারী উর্দুভাষী মুসলমানদের প্রকৃত সংখ্যা এবং অন্যান্য সরকারি ও বে-সরকারি তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। একই সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির ভোটার তালিকা, নতুন রেশন কার্ড প্রদান, জমিজমা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বসতি-স্থাপন, হঠাৎ গড়ে ওঠা বাসিন্দাদের ঝুপড়ির সংখ্যা ইত্যাদির সামগ্রিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হলে এখানকার জনসংখ্যা-মানচিত্র সম্বন্ধে ধারণা অনেকটা তথ্য-নির্ভর হতে পারে। উল্লেখ্য এই, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যে এক কোটি মানুষ পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভারতে আশ্রয় নেয়, তাদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষ নবগঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ফিরে যায়। এই আশ্রয়গ্রহণকারী নাগরিকদের মধ্যে ৮৫% ছিল হিন্দু। ধর্মীয় সংখ্যালঘু-জনসমষ্টির একটি অংশ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে থেকে যায়, অথবা বিভ্রান্ত হয়ে বাংলাদেশ থেকে অনেকে ফিরে আসে। প্রধানত বৈষম্যমূলক আচরণের ফলেই তারা দেশান্তরিত হয়।[২] বাংলাদেশ রাষ্ট্র স্থাপনের পরে বাংলাদেশ থেকে নাগরিকদের বহির্গমনের চিত্রটি দ্রুত পরিবর্তিত হয়। পূর্বের মতো ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভারতে আগমন অব্যাহত থাকলেও, বাংলাদেশী মুসলমানরাও ভারতে প্রবেশ করতে থাকে। বাংলাদেশীদের এই বহির্গমনই এখন ভারতে 'অনুপ্রবেশ সমস্যা' হিসেবে উল্লিখিত।[৩] একদেশ থেকে অন্যদেশে গিয়ে বসবাস করার বহু ঘটনাই ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা থেকে নানা জনগোষ্ঠীর মানুষ আমেরিকায় বসতি স্থাপন করেছে।[৪] ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত

স্পেন, পর্তুগাল, যুগোশ্লাভিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের বাসিন্দারা জীবন-জীবিকার তাগিদে বেআইনিভাবে প্রবেশ করে বসবাস করছে। এমনকি এশিয়ার কয়েকটি দেশেও দেশান্তর গমনের ঘটনা জানা যায়। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে তারা এক দেশ থেকে আর এক দেশে চলে যায়। তাই দেশান্তর গমন এক আন্তর্জাতিক সমস্যার রূপ ধারণ করেছে।[৫] এই প্রেক্ষিতটি মনে রেখে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ও বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ সমস্যা কোনও জটিলতা সৃষ্টি করছে কিনা, অথবা করতে পারে কিনা, তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

জনবিন্যাস-মানচিত্রটি যাতে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, এই উদ্দেশ্যে এখানে ঔপনিবেশিক আমলের ও তার পরবর্তীকালের জনসংখ্যা-বিষয়ক তথ্যসমূহ উল্লেখ করা হলো। ব্রিটিশ-শাসনকালে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে অসম প্রদেশে বহুসংখ্যক মুসলমানের বহির্গমন ঘটে। হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ থেকে অসমে প্রবেশ করলেও তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা বহুগুণ বেশি ছিল। উনিশ শতকে অসম প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় কত সংখ্যক ও কত শতাংশ মুসলমান ছিল, তার একটি হিসেব সেন্সাস রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায় :[৬]

জেলা	মুসলমানদের সংখ্যা		সমগ্র জনসংখ্যার শতাংশ	
	১৮৮১	১৮৯১	১৮৮১	১৮৯১
কাছার প্লেইন্স	৯২.৩৯৩	১১২.৮৫৬	৩১·৪৫	৩[illegible]·৭০
সিলেট	১,০১৫,৫৩১	১,১২৩,৯৮৪	৫১·৫৭	৫২·১৬
গোয়ালপাড়া	১০৪,৭৭৭	১২৪.৪৫৫	২৩·৫৮	২৭·৫১
কামরূপ	৫০,৪৫২	৫৫,৩৫০	৭·৮২	৮·৭২
দরং	১৫,৭০৪	১৮,৪৫৪	৫·৬৭	৫·৯৯
নওগাঁও	১২,০৭৪	১৪,১৩৭	৩·৮৮	৪·১০
শিবসাগর	১৫.৬৬১	১৯.৮০৫	৪·২৩	৪·৩৩
লখিমপুর	৫,৮২৪	৮,০৮৬	৩·২৩	৩·১৮
নর্থ কাছাড়	৩	১৫	·০১	·০৭
নাগা হিলস	৯৪	২০৯	·১০	·১৭
খাসি অ্যান্ড জয়ন্তিয়া হিলস	৫৭০	৮২০	·৩৩	·৪১
গারো হিলস	৪,১৩৫	৫,৫৯৭	৩.৭৭	৪·৬০
নর্থ লুসাই (সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি)	—	২১৬	—	১০.৫৬
প্রদেশের মোট সংখ্যা	১,৩১৭,০২২	১,৪৮৩,৯৭৪	২৬·৯৮	২৭·০৯

সেন্সাস অনুযায়ী অসম প্রদেশের জনসংখ্যার যে হিসেব পাওয়া যায়, তা এখানে উল্লেখ করা হলো :[৭]

বছর		জনসংখ্যা
১৮৯১	...	৫,৮৪৪,০০০
১৯০১	...	৬,২০০,০০০
১৯১১	...	৭,০৯৮,০০০
১৯২১	...	৮,০০৫,০০০
১৯৩১	...	৯,২৪৭,৮৫৭

মুসলিম জনসংখ্যার হিসেব অনুযায়ী প্রথম ছিল পাঞ্জাব, দ্বিতীয় বাংলা এবং তৃতীয় অসম। অসম প্রদেশের শ্রীহট্ট (সিলেট), কাছাড় ও গোয়ালপাড়া ছিল তিনটি বাংলাভাষী জেলা এবং এখানে মুসলমানরাই ছিল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। ওপরে উল্লিখিত তথ্য থেকে দেখা যায়, ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অসমে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ১,৪৮৩, ৯৭৪ এবং অসমের সমগ্র জনসংখ্যার ২৭.০৯ শতাংশ। শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া বাদ দিলে, বাদবাকি অসমের সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র ৪'৯ শতাংশ ছিল মুসলমান।[৮]

অসমের মুসলিম-জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পর্যালোচনা করতে হলে সুরমা উপত্যকা, গোয়ালপাড়া জেলা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার শহরগুলিতে বাইরে থেকে আগমনকারীদের উল্লেখ করতে হয়। উনিশ শতকের শেষদিক থেকেই বহু-সংখ্যক মুসলমান ক্রমাগত পূর্ববঙ্গ থেকে অসমে প্রবেশ করে। ময়মনসিংহ থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মুসলমানদের আগমনের ফলেই মুসলিম-জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে অসম প্রদেশের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ হলো মুসলমান। তাছাড়া ভারতের অন্যান্য জায়গা থেকে চাবাগানগুলিতে বহু সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের আগমন ঘটে। আর নেপালীদের আগমনের তথ্যও পাওয়া যায়।[৯] গোয়ালপাড়া হলো পূর্ববঙ্গের রংপুর ও ময়মনসিংহের সীমানা-সংলগ্ন অঞ্চল। তাই এইসব জেলার, বিশেষ করে ময়মনসিংহের মুসলমানরা বেশি সংখ্যায় গোয়ালপাড়ায় প্রবেশ করে। গোয়ালপাড়ার চরগুলি তাদের অভিযানের লক্ষ্যস্থল হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে শিবসাগর ও লখিমপুর জেলায় পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের অভিযান ঘটেনি। তখনও পর্যন্ত বাঙ্গালী মুসলমানদের গন্তব্যস্থল ছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা। এই সময়ে সুরমা উপত্যকায় মুসলমানদের বসতি-স্থাপন সম্পন্ন হয় এবং এই অঞ্চলে মুসলমানরা তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়। মুসলিম

হারে শ্রীহট্টে হ্রাস-বৃদ্ধি পায়, তা সেন্সাস রিপোর্ট থেকে এখানে উল্লেখ করা হলো :[১০]

বছর		মুসলিম		হিন্দু
১৯০১	...	৫২.৬%	...	৪৬.৮%
১৯৩১	...	৫৮.৯%	...	৪০.৯%

একই সময়কালে কাছাড়ে মুসলিম-জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল :[১১]

১৯০১	...	৩০.৫%
১৯৩১	...	৩৬.৪%

দুটি স্তরের মধ্য দিয়ে গোয়ালপাড়া ও নওগাঁও জেলায় ব্যাপকভাবে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মুসলমানদের বসতি স্থাপিত হয় এবং তাদের কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সমগ্র গোয়ালপাড়া জেলায় তারা বসতি স্থাপন করে। ১৯২১—১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে নওগাঁও জেলাতেও মুসলমানদের ব্যাপকভাবে বসতি-স্থাপন সম্পন্ন হয়। তারপরে তারা কামরূপ জেলার বরপেটা মহকুমায় প্রবেশ করে। ডারাং জেলাতেও তাদের বসতি স্থাপিত হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ কয়েক হাজার 'ময়মনসিংহাস' উত্তর লখিমপুরেও প্রবেশ করে।[১২] এইভাবে খুব দ্রুত অসম উপত্যকার খালি জায়গাগুলিতে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা তাদের আবাসস্থল গড়ে তোলে। কত সংখ্যক 'ময়মনসিংহা' অসমে প্রবেশ করেছিল, তা এখানে উল্লেখ করা হলো :[১৩]

বছর		হিন্দু		মুসলিম
১৯২০-২১	...	৩,২১৯	...	৩০.১০৬
১৯২১-২২	...	৪,৮৭৮	...	৪১ ৪৮৭
১৯২২-২৩	...	৫,৯৬০	...	৫০,৭৯০
১৯২৩-২৪	...	৭,৭৮৯	...	৫৫,২৯৩
১৯২৪-২৫	...	৭,৬১৯	...	৬৪,১১২
১৯২৫-২৬	...	৯,৬৪৩	...	৭৪,৬৮২
১৯২৬-২৭	...	৮,৮৯৯	...	৭৫,৮৫৭
১৯২৭-২৮	...	১১,৩৬৩	...	৮৪,০৯৮
১৯২৮-২৯	...	১১,৬১৪	...	৮৭,৪৩৬
১৯২৯-৩০	...	১৩,২৮৫	...	৮৯,০১৮

সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী অসমের যে জনসংখ্যার চিত্রটি পাওয়া যায়, তাও পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো :[১৪]

বছর		জনসংখ্যা
১৮৯১	...	৫,৮৪৪,০০০
১৯০১	...	৬,২০০,০০০
১৯১১	...	৭,০৯৮,০০০
১৯২১	...	৮,০০৫,০০০
১৯৩১	...	৯,২৪৭,৮৫৭

তখন অসম প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে মুসলিম-জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য ছিল না। চাবাগানে 'কুলি' হিসেবে মুসলমানরা ছিল না বললেই চলে। মুসলমানরা প্রধানত কৃষিকাজের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। শহরাঞ্চলে বহু দোকানদার ছিল মুসলমান। মুসলিম-জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আইন ও অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত মুসলমানদের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। জনবিন্যাস-মানচিত্রের পরিবর্তনের ফলে মুসলমানরা আত্মসচেতন হয় এবং সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্য-বোধও প্রকট হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই এখানে ইসলাম ধর্মতত্ত্ববিদদের আবির্ভাব ঘটে এবং তাঁরা এই বৃহত্তর মুসলিম জনসমষ্টিকে ইসলামিকরণের প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়াসী হন। তার প্রভাব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও পড়ে। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মুসলমানরা প্রথমে সরকারি পতিত জমিতে বসতি স্থাপন করে। তাদের 'জমির ক্ষুধা' এত তীব্র ছিল যে, তারা সরকারি সংরক্ষিত জমি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের জমিজমাতেও বেআইনী প্রবেশ করতে থাকে। এই বসতি-স্থাপনকে নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুযায়ী পরিচালনার উদ্দেশ্যে এবং জমি-দখলকে কেন্দ্র করে সংঘাত পরিহার করার জন্য ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে অসম-সরকার কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করে। তাকে 'লাইন প্রথা' বলা হয়। এই লাইন প্রথা অনুযায়ী বাঙালী মুসলমানদের অসমীয়া গ্রামের কাছে জমি দখল অথবা ক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু এই 'লাইন প্রথা' অসমীয়া গ্রামগুলিকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। এই প্রথাকে কেন্দ্র করে অসম রাজনীতিতে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। মুসলমানরা এই প্রথার অবসান দাবি করে। অন্যদিকে অসমীয়া হিন্দু ও স্থানীয় বাসিন্দারা এই প্রথা সুদৃঢ়ভাবে প্রয়োগের দাবি করে। নিজেদের প্রদেশে সংখ্যালঘু হয়ে যাবে এমন আশংকা অসমীয়া হিন্দুদের মধ্যে দেখা দেয়। 'অসমীয়া জাতি বিপন্ন', এই ধরনের শ্লোগানও তোলা হয়। অন্যদিকে অসমীয়া মুসলমানরা বাঙালী মুসলমানদের আগমনকে স্বাগত জানায়। তাদের সাহায্যে অসমীয়া রাজনীতিতে মুসলমানদের প্রভাব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এইভাবে অসম প্রদেশের জনসাধারণ সাম্প্রদায়িকভাবে

বিভক্ত হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ-শাসনের অবসান পর্যন্ত 'লাইন প্রথা' অসমীয়া রাজনীতির এক মস্তবড় ক্ষত চিহ্ন হিসেবে বিরাজ করে।[১৫]

এবার ঔপনিবেশিক বাংলার জনসংখ্যা-মানচিত্রের দিকে তাকানো যাক। **উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টিতে পরিণত হয়।** তারপর থেকে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকে। সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে মুসলিম-জনসমষ্টির সংখ্যাবৃদ্ধির হার নিম্নরূপ ছিল :[১৬]

মুসলমান (১৮৮১ খ্রি:—১৯৩১ খ্রি:)

প্রদেশ ইত্যাদি		শতকরা ভিন্নতার মাত্রা (Variation%) ১৯২১-১৯৩১		শতকরা ভিন্নতার মাত্রা (Variation%) ১৮৮১-১৯৩১
ভারত	...	+ ১৩'০	—	+ ৫১'০
ব্রিটিশ প্রভিন্সেস	...	+ ১২'৭	—	+ ৪৮'৫
আজমীর-মারওয়াড়া	...	— ৪'৬	—	+ ৬৮'০
আসাম	...	+ ২৫'১	—	+ ১০৯'৩
বালুচিস্থান	...	+ ১০'৪	—	—
বেঙ্গল	...	+ ৯'১	—	+ ৪৬'৫
বিহার এবং ওড়িশা	...	+ ১৫'৬		
বোম্বে	...	+ ১৬'৭	—	+ ৪৭'৫
বর্মা	...	+ ১৬'৮	—	+ ২৪৬'৩
সি. পি. এবং বেরার	...	+ ২১'২	—	+ ৪৭'৪
কুর্গ	...	+ ৫'৮	—	+ ৯'৯
মাদ্রাজ	...	+ ১৬'৪	—	+ ৭১'০
দিল্লি	...	+ ৪৬'০	—	+ ৪৯'৮
পঞ্জাব	...	+ ১৬'৩		
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	...	+ ৮'০		
যুক্ত প্রদেশ	...	+ ১০'৮	—	+ ২১'৩
স্টেট্‌স্ এবং এজেন্সিস	...	+ ১৪'৭	—	+ ১১৩'৪

পূর্ব পৃষ্ঠার উল্লিখিত তথ্য থেকে বোঝা যায়, ভারতের প্রতিটি প্রদেশে মুসলিম জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে লোকসংখ্যা পরিবর্তনের পরিমাণ (দেশীয় রাজ্য বাদ দিয়ে) এখানে উল্লেখ করা হলো :[১৭]

বছর	প্রকৃত লোক সংখ্যা	পরিবর্তন ...	শতকরা পরিবর্তন	পরিবর্তনের সময়
১৮৯১	৩৯,০৯৭,০২৩			
১৯০১	৪২,১৪৯,১৫৪	+ ৩,০৫২,১৩১	+ ৭.৮	১৮৯১—১৯০১
১৯১১	৪৫,৪৯১,০৫৬	+ ৩,৩৪১,৯০২	+ ৮.০	১৯০১—১৯১১
১৯২১	৪৬,৭০৩,৭০২	+ ১,২১২,৬৪৬	+ ২.৮	১৯১১—১৯১২
১৯৩১	৫০,১১৭,৫৪৮	+ ৩,৪১১ ৮৪৬	+ ৭.৩	১৯২১—১৯৩১
১৯৪১	৬০,৩০৬,৫২৫	+ ১০,১৯০,৯৭৭	+ ২০.৩	১৯৩১—১৯৪১
মোট		+ ২১,২০৯,৫০১	+ ৪৩.১	১৮৯১—১৯৪১

এই হিসেব থেকে দেখা যায়, ১৯৩১-১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির শতকরা হার হলো ২০.৩। অথচ ১৮৯১-১৯০১ খ্রিস্টাব্দে শতকরা বৃদ্ধির হার ৭.৮, ১৯০১-১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ৮.০, ১৯১১-১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ২.৮ এবং ১৯২১-১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ৭.৩ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে এবং ব্যাপক ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর ফলে ১৯১১-১৯২১ খ্রিস্টাব্দে লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার হঠাৎ এতটা হ্রাস পায়। নৃতত্ত্ববিদ তারকচন্দ্র দাস ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে যে তথ্যপূর্ণ সমীক্ষা করেন, তাতে তিনি ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লোকসংখ্যার হিসেব বিশ্লেষণ করে দেখান, ১৯৩১-১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে লোকসংখ্যা হঠাৎ এতটা বৃদ্ধি পায় যে, এই লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হারকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়া যায় না। তিনি মন্তব্য করেন, এই সময়ের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার রাজনৈতিক কারণ ছাড়া অন্য কোনওভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশে হিন্দুরা ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস বয়কট করে। কিন্তু ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাসের সময়ে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোক-সংখ্যা বেশি করে দেখান। তার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। এই কারণে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের লোকসংখ্যার হিসেব ব্যবহার করা মোটেই নিরাপদ নয়।[১৮]

১৯০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেন্সাস রিপোর্ট অবলম্বন করে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির যে হিসেব পাওয়া যায় (Number per 10,000 of the population), তা হলো :[১৯]

সম্প্রদায়	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১
হিন্দু	৪,৬৬০	৪,৪৮০	৪,৩২৭	৪,৩০৪	৪,১৫৫
মুসলমান	৫,১৫৮	৫,২৭৪	৫,৩৯৯	৫,৪৮৭	৫,৪৭৩
খ্রিস্টান	২৫	২৯	৩১	৩৬	২৮
জৈন	১	১	৩	২	২
শিখ	—	১	—	২	৩

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম জনসংখ্যা নিম্নরূপ ছিল :[২০]

ব্রিটিশ জেলা	সমস্ত বয়সের (All Ages)	মোট সংখ্যার শতকরা হার (Percentage of total)	কেবলমাত্র বয়স্ক (কুড়ি বৎসর ও তার উর্ধ্বে)	মোট সংখ্যার শতকরা হার (Percentage of total)
বাংলার মোট জনসংখ্যা	৫০,১১৪.০০২	১০০	২৪,৮৭৩,৩০৯	১০০
মুসলমান	২৭,৪৯৭,৬২৪	৫৫	১২,৮৫৫,৫৭০	৫২
হিন্দু	২১,৫৭০,৪০৭	৪৩	১১,৫০৩,৬৬৮	৪৬

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ বাংলার বিভিন্ন জেলার হিন্দু ও মুসলমান লোকসংখ্যার যে-তালিকা তৈরি করেন, তা থেকে হিন্দু ও মুসলিম-প্রধান জেলাগুলির স্বচ্ছ পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে তাঁর তৈরি টেবিল উল্লিখিত হলো :[২১]

(ক) যে-সমস্ত জেলায় হিন্দুর সংখ্যা বেশি

জেলার নাম	লোকসংখ্যা (হাজার)	শতকরা কতজন মুসলমান	হিন্দু	অন্যান্য
বাঁকুড়া	১২৯০	৪·৩	৮৩·৬	১২·১
বীরভূম	১০৪৮	২৭·৪	৬৫·৫	৭·১
বর্ধমান	১৮৯১	১৭·৮	৭৩·৭	৮·৫
মেদিনীপুর	৩১৯১	৭·৭	৮৪·১	৮·২
হাওড়া	১৫৯০	১৯·৯	৭৯·৫	০·৬

জেলার নাম	লোকসংখ্যা (হাজার)	শতকরা কতজন মুসলমান	হিন্দু	অন্যান্য
হুগলী	১৩৭৮	১৫.০	৭৯.৮	৫.২
২৪ পরগণা	৩৫৩৬	৩২.৫	৬৫.৩	২.২
কলিকাতা	২১০৯	২৩.৬	৭২.৬	৩.৮
খুলনা	১৯৪৩	৪৯.৪	৫০.৩	০.৩
জলপাইগুড়ি	১০৯০	২৩.০	৫০.৬	২৬.৪

(খ) যে-সমস্ত জেলায় মুসলমানের সংখ্যা বেশি

জেলার নাম	লোক সংখ্যা (হাজার)	শতকরা কতজন মুসলমান	হিন্দু	অন্যান্য
বাখরগঞ্জ	৩৫৪৯	৭২.৩	২৭.০	০.৭
বগুড়া	১২৬০	৮৪.০	১৪.৮	১.২
চট্টগ্রাম	২১৫৩	৭৪.৬	২১.৩	৪.১
ঢাকা	৪২২২	৬৭.৩	৩২.২	০.৫
দিনাজপুর	১৯২৭	৫০.২	৪০.২	৯.৬
ফরিদপুর	২৮৮৯	৬৪.৮	৩৪.৮	০.৪
যশোহর	১৮২৮	৬০.২	৩৯.৪	০.৪
মালদহ	১২৩৩	৫৬.৮	৩৭.৮	৫.৪
মুর্শিদাবাদ	১৬৪১	৫৬.৬	৪১.৭	১.৭
ময়মনসিংহ	৬০২৪	৭৭.৪	২১.৫	১.১
নদীয়া	১৭৬০	৬১.২	৩৭.৪	১.৪
নোয়াখালী	২২১৭	৮১.৪	১৮.৬	০.০
পাবনা	১৭০৫	৭৭.১	২২.৫	০.৪
রাজসাহী	১৫৭২	৭৪.৬	২১.০	৪.৪
রংপুর	২৮৭৮	৭১.৪	২৭.৯	০.৭
ত্রিপুরা	৩৮৬০	৭৭.১	২২.৮	০.১

এখানে উল্লিখিত ২৬ জেলার মধ্যে ১০ জেলায় হিন্দুরা এবং ১৬ জেলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

(গ) যে-সমস্ত জেলায় অন্য সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেশি

জেলার নাম	লোকসংখ্যা (হাজার)	শতকরা কতজন মুসলমান	হিন্দু	অন্যান্য
পার্বত্য চট্টগ্রাম	২৪৭	২.৮	২.০	৯৫.২
দার্জিলিং	৩৭৬	২.৪	৪৭.৩	৫০.৩

(ঘ) অসমের একটি জেলা

জেলার নাম	লোকসংখ্যা (হাজার)	শতকরা কতজন মুসলমান	হিন্দু	অন্যান্য
শ্রীহট্ট	৩১১৭	৬০'৭	৩৬'৯	২'৪

আলোচনার সুবিধার জন্য জনসংখ্যার সর্বভারতীয় চিত্রটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে পাঁচবার সেন্সাস হয়। এই সময়ে ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দু, মুসলিম ও শিখ জনসংখ্যা নিম্নরূপ ছিল :[২২]

বছর	জনসংখ্যা (দশলক্ষ)	ধর্ম অনুযায়ী জনসংখ্যার শতকরা হার		
		হিন্দু	মুসলিম	শিখ
১৯০১	২৩৮'৪	৭০'৪	২১'২	০'৮
১৯১১	২৫২'১	৬৯'৪	২১'৩	১'০
১৯২১	২৫১'৩	৬৮'৬	২১'৭	১'০
১৯৩১	২৭৯'০	৬৮'২	২২'২	১'২
১৯৪১	৩১৮'৭	৬৫'৯	২৩'৮	১'৫

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ 'লাহোর প্রস্তাব' ('পাকিস্তান প্রস্তাব' নামেও পরিচিত) অনুযায়ী যখন পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের জন্য দাবি করে, তখন সমগ্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম জনসমষ্টির আকৃতি কেমন ছিল, তা ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস থেকে পাওয়া যায়। এখানে এই সেন্সাস থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করা হলো :[২৩]

প্রদেশ এবং রাজ্য	মুসলিম	হিন্দু
বেলুচিস্থান	৮৭'৬	৮'৮
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৯১'৮	৫'৯
সিন্ধু	৭০'৭	২৭'১
পাঞ্জাব	৫৭'১	২৬'৬
কাশ্মীর	৭৬'৪	২০'১
বাংলাদেশ	৫৪'৭	৪১'৮
উত্তরপ্রদেশ	১৫'৩	৮৩'২
বিহার	১৩'০	৭৩'০
ওড়িশা	১'৭	৭৮'৩

প্রদেশ এবং রাজ্য	মুসলিম	হিন্দু
সি. পি. এবং বেরার	৪.৭	৭৬.৯
ত্রিবাঙ্কুর (মালাবার)	৭.৭	৫৮.৪
কোচিন	৭.৭	৬৩.০
গুজরাট	৩.৯	৫২.৪
বেনারস	৮.৪	৯০.৭
রামপুর	৪৯.৩	৪৯.৯

জনসংখ্যার এই সব তথ্য মনে রাখলে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগের পরে জনবিন্যাস-মানচিত্রে যে পরিবর্তন ঘটে, তা বোঝা সহজ হবে। প্রদেশগুলির সীমানা পরিবর্তন হয়, জেলা ও মহকুমাও পুনর্গঠিত হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রেও তা লক্ষ্য করা যায়। ভারতের জনসংখ্যার সঙ্গে পাকিস্তান, পরে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের পরে, এই তিনটি রাষ্ট্রের জনবিন্যাস-মানচিত্রের তুলনামূলক আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে এই সমগ্র অঞ্চলের সম্প্রদায়গত সম্পর্কের চিত্রটি স্বচ্ছ হয় না। বিভিন্ন ধর্মের সহ-অবস্থান ও রাষ্ট্রের বহুধর্মীয় চরিত্র কতটা বজায় রয়েছে, তা বুঝতে হলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হ্রাস-বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। বহু ধর্মের মানুষ একই রকম আইনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে বাস করতে পারছে, এমন পরিবেশকে ভিত্তি করেই একটি 'সিভিল সোসাইটি' গড়ে উঠতে পারে। এই মাপকাঠিতেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনবিন্যাস-মানচিত্রটি বিবেচনা করা দরকার। এই নিবন্ধের বিষয়বস্তুর কথা মনে রেখে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনামূলক আলোচনা করা হলো। প্রথমেই ভারতে হিন্দু, মুসলিম ও শিখ জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার সেন্সাস রিপোর্ট অবলম্বন করে উল্লেখ করছি :[২৪]

বছর	জনসংখ্যা (দশলক্ষে)	ধর্ম অনুযায়ী জনসংখ্যার শতকরা হার		
		হিন্দু	মুসলিম	শিখ
১৯৫১	৩৬১.১	৮৫.০	৯.৯	১.৭
১৯৬১	৪৩৯.২	৮৩.৫	১০.৭	১.৮
১৯৭১	৫৪৮.২	৮২.৭	১১.২	১.৯

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার পরের পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হলো :[২৫]

জম্মু ও কাশ্মীর	৬৫'৮৫	মধ্যপ্রদেশ	৪'৩৬
লাক্ষাদ্বীপ	৯৪'৩৭	হিমাচল প্রদেশ	১'৪৫
অসম	২৪'৫৬	কেরালা	১৯'৫০
পশ্চিমবঙ্গ	২০'৪৬	মনিপুর	৬'৬১
উত্তর প্রদেশ	১৫'৪৮	তামিলনাড়ু	৫'২১
বিহার	১৩'৪৮	হরিয়ানা	৪'০৪
কর্নাটক	১০'৬৩	ওড়িশা	১'৪৯
গুজরাট	৮'৪২	আন্দামান	১০'১২
অন্ধ্রপ্রদেশ	৮'০৪	দিল্লি	৬'৪৭
মহারাষ্ট্র	৮'৪০	পণ্ডিচেরি	৬'১৮
রাজস্থান	৬'৯০	গোয়া	৩'৭৬
ত্রিপুরা	৬'৬৮	চণ্ডীগড়	১'৪৫

দাদরা ও নগর হাভেলি ১'০০

এখানে উল্লিখিত তথ্য থেকে বোঝা যায়, ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অস্থিরতা দেখা দিলেও সামগ্রিকভাবে ভারতের বহুধর্মীয় চরিত্রটি ভেঙে পড়েনি, তা এখনও অটুট রয়েছে। **তাই ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা হ্রাস পায়নি। বিপর্যস্ত হয়ে সংখ্যালঘুরা ভারত-ত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়নি।** এই প্রেক্ষিতটি মনে রেখেই ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্য-সমূহের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাক। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্টের পূর্বে অসম প্রদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে ছিল বর্তমান অসম রাজ্য, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ ও বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত শ্রীহট্ট জেলা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার বদরপুর, পাথরকান্দী, রাতাবাড়ি ও করিমগঞ্জের পুলিশ স্টেশনের অংশ নিয়ে অসম রাজ্যের কাছাড় জেলার অন্তর্ভুক্ত একটি মহকুমা গঠন করা হয়। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাসের সময়কালে নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল প্রদেশ অসম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, আর কামরূপ জেলার ৮৫ স্কোয়ার কিলোমিটার অংশ ভুটানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ১৯৬১-৭১ খ্রিস্টাব্দে মেঘালয় গঠিত হওয়ায় অসম রাজ্যের সীমানা আরও সংকুচিত হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের পরে স্থাপিত হয় মিজোরাম। সুতরাং অসমের জনবিন্যাস-মানচিত্র আলোচনায় এই পরিবর্তন মনে রাখতে হবে। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে অসম রাজ্যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য কোনও সেন্সাস করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭১

খ্রিস্টাব্দ ও ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস থেকে অসম সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এবং পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্য সম্পর্কে ১৯৭১, ১৯৮১ ও ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায় এবং আশীষ বসু যেভাবে তাঁর গ্রন্থে তা সাজিয়ে উল্লেখ করেছেন, তাতে পূর্বাঞ্চলের জনবিন্যাসের চিত্রটি নিম্নরূপ হয় : [২৬]

রাজ্য	জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার (এক দশকের) (Decadal variation in population)		বাৎসরিক পরীক্ষামূলক বৃদ্ধি (Annual Experiment growth)	
	১৯৭১-৮১	১৯৮১-৯১	১৯৭১-৮১	১৯৮১-৯১
ভারত	২৪.৬৬	২৩.৫০	২.২২	২.১১
অরুণাচল প্রদেশ	৩৫.১৫	৩৫.৮৬	৩.০৪	৩.০৬
অসম	২৩.৩৬	২৩.৫৮	২.১২	২.১২
মণিপুর	৩২.৪৬	২৮.৫৬	২.৮৩	২.৫১
মেঘালয়	৩২.০৪	৩১.৮০	২.৮০	২.৩৬
মিজোরাম	৪৮.৩৫	৩৮.৯৮	৩.৯৯	২.২৯
নাগাল্যান্ড	৫০.০৫	৫৬.৮৬	৪.০৯	৪.৫০
ত্রিপুরা	৩১.৯২	২৩.৬৯	২.২৯	২.২৪
পশ্চিমবঙ্গ	২৩.১৭	২৪.৫৫	২.১০	২.২০

এখন জেলান্তরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কেমন ছিল, দেখা যাক : [২৭]

জেলা	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৭১-৯১	জেলা	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৭১-৯১
ধুবরি	+ ৫৫.৭৭	কাছাড়	+ ৪৭.৬৫
কোকরাঝড়	+ ৭৫.৯৪	মারিগাঁও	+ ৫১.০৭
বঙ্গাইগাঁও	+ ৬৪.৪৩	নওগাঁও	+ ৫১.১৭
বরপেতা	+ ৪২.৭১	গোলাঘাট	+ ৫৩.০৯
নলবাড়ি	+ ৪৮.৭২	জোরহাট	+ ৩২.৬৮
কামরূপ	+ ৬৪.৬৯	শিবসাগর	+ ৩৬.৮০
দরং	+ ৫৪.১৭	ডিব্রুগড়	+ ৩৭.২০
শোণিতপুর	+ ৫৬.৪৯	তিনসুকিয়া	+ ৪৭.১৬
লখিমপুর	+ ৫৫.৯১	কর্বি আংলোং	+ ৭২.৭৯
ধেমাজি	+ ১০৪.৪৮	হাইলাকান্দি	+ ৪৭.৭৬

অধ্যাপক রায় বর্মন এই কথাও বলেন, অসম রাজ্যের যে-সব জেলা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সীমানা সংলগ্ন, তাদের মধ্যে জোরহাট ও শিবসাগর জেলা বাদে অন্যসব জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু আদিবাসী অধ্যুষিত কোকরাঝড়, ধেমাজি, করবি আংলং এবং নর্থ কাছাড় হিলস জেলাসমূহে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি।[৩৬] একই সঙ্গে অধ্যাপক রায় বর্মণ এই মন্তব্যও করেন, প্রাসঙ্গিক সেন্সাস টেবিলসমূহ না পাওয়া পর্যন্ত এখানে উল্লিখিত তথ্য থেকে কোনও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করা বিপজ্জনক হবে। অবশ্য আরও অনুসন্ধানের জন্য এইসব তথ্য সহায়ক হবে।[৩৭]

তিনি বলেন, মেঘালয়ের সব জেলাতেই জাতীয় গড় থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। কিন্তু জয়ন্তিয়া হিলস-এর কিছু অংশ এবং ওয়েস্ট গারো হিলস বাদ দিয়ে অন্য অঞ্চলে বাংলাদেশীদের প্রবেশের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তা উপরে উল্লিখিত তথ্য নির্ভর করে বলা মুস্কিল।[৩৮] মিজোরামের লুঙ্গলেই বাদ দিয়ে আইজল ও ছিমতুই পুই জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই বেশি। ছিমতুই পুই জেলায় বাংলাদেশ থেকে বহুসংখ্যক চাকমারা প্রবেশ করেছে। তাছাড়া বর্মা ও বাংলাদেশ এবং নিকটস্থ ভারতীয় অঞ্চলের মিজোদের সংখ্যাও মিজোরাম রাজ্যে কম নয়।[৩৯] নাগাল্যান্ড ও মণিপুরের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনও সাধারণ সীমানা নেই, কিন্তু বর্মার সঙ্গে আছে। বর্মায় কিছু নাগা ও কুকি জাতিগোষ্ঠীর মানুষ আছে। বাংলাদেশ থেকে এসে বহু বাংলাদেশী হিন্দু ও মুসলমান নাগাল্যান্ড ও মণিপুর রাজ্যে এসে বসবাস করছে। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস থেকে তথ্য পাওয়া গেলে ভিন্ন দেশ থেকে আগত জনসংখ্যা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা করা যাবে।[৪০] অরুণাচল রাজ্যেরও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনও সাধারণ সীমানা নেই, কিন্তু বর্মা, তিব্বত ও ভুটানের সঙ্গে সাধারণ সীমানা আছে। এখানে সীমানা অতিক্রম করে সব সময়েই জনসাধারণের যাতায়াত চলে। বহুসংখ্যক নেপালী ও বাংলাদেশী অরুণাচল রাজ্যে বসবাস করছে।[৪১] ত্রিপুরার সব জেলার সঙ্গেই বাংলাদেশের সাধারণ সীমানা রয়েছে। ত্রিপুরার প্রতিটি জেলারই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় গড় থেকে অনেক বেশি। বাংলাদেশের হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও অন্যান্য উপজাতির মানুষ ত্রিপুরায় বসতি স্থাপন করেছে।[৪২]

অধ্যাপক রায় বর্মন লেখেন, ১৯৭১-৮১ খ্রিস্টাব্দে বিহারের পূর্ণিয়া ও কিষেণগঞ্জ জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৮১-৯১ দশক থেকে অনেক বেশি ছিল। বস্তুত ১৯৮১-৯১ খ্রিস্টাব্দে পূর্ণিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায়

জাতীয় গড়ের সমান ছিল, কিন্তু কিষেনগঞ্জের বৃদ্ধির হার ছিল জাতীয় গড় থেকে কম। এই তথ্য থেকে তিনি বলেন, এই অঞ্চলে বহু বাংলাদেশীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে এমন কথা বলা যায় না। অবশ্য তিনি স্বীকার করেন, এই দুটি জেলার 'কিছু পকেটে' বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। এই কথাও তিনি স্বীকার করেন, উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু অঞ্চলে প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অনুপ্রবেশ ঘটেছে।[৪৩]

পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস আলোচনায় অধ্যাপক রায় বর্মন লেখেন, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা বাদে অন্য যে-সব জেলার সঙ্গে বাংলাদেশের সাধারণ সীমানা রয়েছে, সেই সব জায়গার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি। বাংলাদেশের সীমানা থেকে দূরের জেলাগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনামূলক আলোচনা করলে সীমানার নিকটবর্তী জেলাগুলির জনবিন্যাস-মানচিত্র আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলাদেশ সীমানার নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী জেলাগুলির জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির কোনও সঙ্গতি-পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় না। সীমানার নিকটবর্তী কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও নদীয়া জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। পশ্চিম দিনাজপুর ও উত্তর চব্বিশ পরগণায় সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই বেশি। সীমানা থেকে দূরবর্তী কেবলমাত্র হুগলী জেলাতেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পায়, অন্যসব জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশীই থাকে।[৪৪]

অধ্যাপক রায় বর্মন সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রেক্ষাপটে ভারত ও বাংলাদেশের জনবিন্যাস প্রশ্নটি আলোচনা করতে গিয়ে এই তথ্যসমূহ উদ্ধৃত করেন :

[ক]

দেশ	১৯৯২ খ্রিঃ মধ্যবর্তী সময়ে জনসংখ্যা	বাৎসরিক ক্রমবৃদ্ধি হার	স্বাভাবিক জন্মের হার	স্বাভাবিক মৃত্যুর হার	প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনবসতির ঘনত্ব
বাংলাদেশ	১১১,৭০১	২'৪৪	৩৮'২	১৩'৮	৭৭৬
ভারত	৮৭৯,৫৪৮	১'৯১	২৯'৩	১০'২	১৬৮
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	১,২৩৪,৭০১	২'১৫	৩২'০	১০'৬	১৮২

[খ]

দেশ	প্রতিশতে শহুরে জনসংখ্যা	মাথাপিছু জি.এন.পি (মার্কিন ডলার $)	গর্ভনিরোধ ব্যবস্থা (প্রতিশতে)
বাংলাদেশ	১৭.৭	২১০	৩১
ভারত	২৫.৭	৩৫০	৪৫
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া	২৬.৯	৪৪৪	—

এই তথ্য থেকে স্পষ্ট করেই বোঝা যায়, বাংলাদেশের বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভারত থেকে অনেক বেশি। বাংলাদেশে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে, তা উল্লেখযোগ্য বলেই অধ্যাপক রায় বর্মন মনে করেন। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ক তথ্য যে নির্ভরযোগ্য নয়, সেবিষয়ে পরে এই নিবন্ধে উল্লেখ করা হলো। তাছাড়া অধ্যাপক রায় বর্মন এখানে বাংলাদেশের স্বাভাবিক জন্ম ও মৃত্যুর হার যা উল্লেখ করেছেন, তাও বাংলাদেশ সেন্সাস অনুযায়ী ঠিক নয়। আর তাঁর উল্লিখিত জনবসতির ঘনত্বও যথার্থ নয়। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের বাংলাদেশ সেন্সাস অনুযায়ী প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনবসতির ঘনত্ব ৭৪০ ছিল। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘণত্ব ৮৪০ হয়।[৪৬]

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল টি. ভি. রাজেশ্বর একটি প্রবন্ধে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস-মানচিত্রকে কিভাবে পরিবর্তিত করছে, তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন।[৪৭] তিনি ১৯৭১ ও ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট পর্যালোচনা করে যেভাবে বিষয়টি দেখেন, তা এখানে উল্লেখ করা হলো। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস থেকে জানা যায়, তখন পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার হার ছিল ২০.৪৬% এবং ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস অনুযায়ী এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২১.৫১% হয়।[৪৮] ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ছিল ৫৪,৫৮০,৬৪৭।[৪৯] এই সময়ে বিভিন্ন জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা বীরভূম জেলায় ৩১% থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার ৫৮.৬৬% সীমারেখার মধ্যেই ছিল।[৫০] পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ এবং উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার মুসলিম জনসংখ্যা এই সীমারেখার মধ্যেই রয়েছে। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস থেকে এখানে কয়েকটি জেলার মুসলিম জনসংখ্যার হার উল্লেখ করা হলো :[৫১]

জেলা		জনসংখ্যার শতকরা হার
বীরভূম	...	৩০.৯৭%
পশ্চিম দিনাজপুর	...	৩৫.৭৯%
মালদহ	...	৪৫.২৭%
মুর্শিদাবাদ	...	৫৮.৬৬%

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যার এক দশকের বৃদ্ধির হার (decadal growth rate) হলো ২৯.৬%, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের সামগ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হলো ২৩.২%।[৫২] প্রসঙ্গত টি. ভি. রাজেশ্বর এই কথাও বলেন, বাংলাদেশীদের বিশেষ করে অবাঙালী মুসলমানদের বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশের একটি পথ হলো পশ্চিম দিনাজপুর হয়ে কিষেনগঞ্জ অঞ্চলের পথ। তাঁর মতে, ভারতের সর্বত্র বাংলাদেশীরা ছড়িয়ে পড়ছে। নেপালীদের পরেই তাদের দেখতে পাওয়া যায়। অসম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারেই বাংলাদেশীদের আগমনের ফলে সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ছে। দেশভাগের পরে ত্রিপুরার আদিবাসীরা সমতলভূমির জনসাধারণের আগমনের ফলে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন বিহারের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বিশেষ করে পূর্ণিয়া জেলায় বহু বাংলাদেশীদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে টি. ভি. রাজেশ্বর রাজ্যপাল হিসেবে অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি যে এই সমস্যার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তা বলাই বাহুল্য।[৫৩] পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর প্রবন্ধে উল্লিখিত তথ্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বলে কোনও সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য মুর্শিদাবাদ জেলার জনসংখ্যার যে হিসেব টি. ভি. রাজেশ্বর দেন, তাতে মুদ্রণ-ত্রুটি ছিল বলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুর সঙ্গে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। পরে রাজেশ্বর তা উল্লেখ করেন।[৫৪]

একই বিষয় নিয়ে ভারতের প্রাক্তন বিদেশ সচিব ও বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞ মুচকুন্দ দুবে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। যে-পদ্ধতিতে ভারত সরকার 'অপারেশন পুশ ব্যাক' (Operation Push-back) কার্যকর করার চেষ্টা করে, তিনি তার সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, একতরফা বাংলাদেশ থেকে যে লোকজন ভারতে প্রবেশ করছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ভারত থেকে কেউ বাংলাদেশে বসবাসের জন্য প্রবেশ করছে না। তিনি মনে করেন, এই অবৈধ অনুপ্রবেশ হলো একটি দরিদ্র দেশ থেকে আর-একটি অপেক্ষাকৃত কম দরিদ্র দেশে জন-

সাধারণের প্রবেশ। জল যেমন উঁচু জায়গা থেকে নিচের দিকে বয়ে যায়, তেমনি সাধারণ মানুষও জীবিকার তাগিদে অধিকতর সুযোগ-সুবিধার জন্য অন্যত্র গমন করে। যতদিন পর্যন্ত না বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে, ততদিন পর্যন্ত এই ধরনের এক দেশ থেকে অন্য দেশে আগমন ঘটবেই। সুতরাং মুচকুন্দ দুবে মনে করেন, বাংলাদেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলেই এই আগমন বন্ধ হতে পারে। আর বাংলাদেশের উন্নয়নে ভারত সাহায্য করতে পারে।[৫৫] তিনি এই কথাও বলেন, এই অনুপ্রবেশের সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। তাছাড়া এই বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের 'দুরভিসন্ধিপূর্ণ' কোনও পরিকল্পনাও নেই। প্রধানত 'অর্থনৈতিক কারণেই' বাংলাদেশীরা ভারতে প্রবেশ করছে। তাঁর মতে, অনুপ্রবেশ সমস্যা হলো 'স্বাভাবিক বিশ্বসমস্যা'।[৫৬] পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল রাজেশ্বরের মতো এই সমস্যা তাঁকে মোটেই বিচলিত করেনি। মুচকুন্দ দুবে মনে করেন, সম্ভবত বাংলাদেশ থেকে ৪-৫ লক্ষের বেশি মানুষ ভারতে আসেনি এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে তারা বে-আইনীভাবে এখানে থেকে যাচ্ছে। একই সঙ্গে তিনি এই কথাও বলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করা খুবই কষ্টকর।[৫৭] অধ্যাপক রায় বর্মন ও মুচকুন্দ দুবে উভয়েই মনে করেন, অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা বিজেপি-উল্লিখিত ১৪ অথবা ১৫ মিলিয়ন থেকে অনেক কম হবে। তবে অধ্যাপক রায় বর্মন মুচকুন্দ দুবের মতো স্পষ্ট করে বলেননি, বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ৫ লক্ষের বেশি হবে না।[৫৮] এমনকি মুচকুন্দ দুবে অনুপ্রবেশ সমস্যাকে 'কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা' বলেও মনে করেন না। পিপলস ডেমোক্র্যাসিতে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ পড়ে এই ধারণা হবে। কিন্তু টি. ভি. রাজেশ্বর এই সমস্যাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।[৫৯] বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আলোচনা করতে গিয়ে মুচকুন্দ দুবে লেখেন: বি. জে. পি. বা অন্যান্য যারা অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা খুব বেশি করে দেখায়, তারা মনে করে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের বাংলাদেশ সরকারের জনগণনায় প্রদত্ত হিসেব এবং আসল লোকসংখ্যার মধ্যে ৭ থেকে ১০ মিলিয়ন মানুষের তফাৎ রয়েছে। এই কথা যদি সত্য হয়ও, তাহলেও এই কথা কখনও বলা যাবে না যে, প্রকৃত লোকসংখ্যা প্রদর্শিত লোকসংখ্যা থেকে কম, এই রকম ঘটনা ঘটেনা। ভারতের ক্ষেত্রে তো এই ধরনের ঘটনা বহুবার ঘটেছে। বাংলাদেশে ৩·১ শতাংশ হারে জনবৃদ্ধি ধরে জনসংখ্যা দেখানো হয়েছিল, কিন্তু ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী জনসংখ্যা

বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ২.৪ শতাংশ। মুচকুন্দ দুবে মনে করেন, বাংলাদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সর্বগ্রহণযোগ্য হওয়াতেই এই সুফল পাওয়া গেছে। এই পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতার হার বাংলাদেশে ৫৪ শতাংশ, যেখানে ভারতে তা ২১ শতাংশ এবং পাকিস্তানে ১৪ শতাংশ।[৬০] মুচকুন্দ দুবে তাঁর প্রবন্ধে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যেসব তথ্য দিয়েছেন তা যে যথার্থ নয়, তা এই নিবন্ধের যথাস্থানে উল্লেখ করা হলো।

তিনি এই সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে এমন সব মন্তব্য করেছেন যা কখনো কখনো পরস্পর-বিরোধী মনে হবে। তাঁর 'হিন্দু' কাগজে প্রকাশিত প্রবন্ধের সঙ্গে 'পিপলস ডেমোক্র্যাসি' কাগজে প্রকাশিত প্রবন্ধের তুলনামূলক আলোচনা করলেই তা বোঝা যায়।[৬১] প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেগম জিয়ার পক্ষে অনুপ্রবেশ মেনে নেওয়া অসুবিধাজনক, তা মুচকুন্দ দুবে বলেন। বাংলাদেশ থেকে ভারতে ব্যাপকভাবে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটেনি বলে বেগম জিয়া যা বলেন, তা তাঁর আগের সরকার প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় থেকেই বলা হয়। তা সত্ত্বেও এই অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে বাংলাদেশ সরকার ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছে। ভারত সরকার একতরফা 'অপারেশন পুশব্যাক' করতে গিয়ে সহযোগিতার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে বলে মুচকুন্দ দুবে মনে করেন। প্রসঙ্গত তিনি এই কথাও বলেন, লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী ভারতে ঢুকেছে বলে যে অভিযোগ করা হচ্ছে তাদের ফিরিয়ে নেওয়া তো বেগম জিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা ধরে নিতে পারি মুচকুন্দ দুবে ৪-৫ লক্ষ অনুপ্রবেশকারীর কথা মনে রেখেই এখানে লক্ষ লক্ষ (মিলিয়নস) শব্দ চয়ন করেছেন। তিনি আর একটি প্রশ্নও উত্থাপন করেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্র স্থাপনের পরে যারা সঙ্গোপনে ভারতে প্রবেশ করে রেশন কার্ড পেয়েছে এবং ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে 'প্রকৃতপক্ষে' (de facto) নাগরিকে পরিণত হয়েছে, তাদের কি করে 'বাংলাদেশী' বলে প্রমাণ করা সম্ভব? তাঁর মতে, তারা তো 'বাংলাভাষী ভারতীয়'।[৬২] তাই মুচকুন্দ দুবে বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করতে হলে এই 'অপারেশন পুশব্যাক' বন্ধ করা দরকার। 'অবৈধ অনুপ্রবেশ' যাতে না ঘটতে পারে, তারজন্য ভারত সরকারকে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। বি. জে. পি. ও তার সহযোগীরা অনুপ্রবেশ নিয়ে যে অপপ্রচার করছে, তা প্রতিহত করতে হবে। একই সঙ্গে 'হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে এই আশঙ্কা ব্যক্ত হয় যে, এই শতাব্দীর শেষে এবং তার পরে দেশান্তর গমন একটি মস্তবড় আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে। ভারত ও

বাংলাদেশ উভয়কেই তাদের পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সহযোগিতা করা উচিত। মুচকুন্দ দুবে এই প্রবন্ধে ৪-৫ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী এই মুহূর্তে কোনও গভীর সমস্যা সৃষ্টি করবে বলে মনে না করলেও, এই সমস্যা সংকট সৃষ্টি করতে পারে, এমন আশংকাও ব্যক্ত করেন। বি. জে. পি. অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা ১৪-১৫ মিলিয়ন বলে যে সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ প্রচার করছে তা এখন জাতীয় সংহতির পথে মস্তবড় অন্তরায় হয়েছে। তাই তিনি মনে করেন, "বি. জে. পি.-কে এই রাস্তায় চলতে দিলে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।"[৬৩]

এখন এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর মতামত উল্লেখ করছি। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুখ্য-মন্ত্রীদের সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বলেন, তা থেকেই এখানে তথ্য উল্লেখ করা হলো। জ্যোতি বসু লেখেন: "বাংলাদেশ থেকে অনু-প্রবেশের কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের পূর্ণাঙ্গ ও বাখ্যাসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের দেশের সীমান্তের বৈশিষ্ট্যই অনুপ্রবেশের সমস্যা সমাধানের অন্যতম বাধা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও সীমান্তের ওপারের বিভিন্ন ঘটনার প্রতিক্রিয়াতে অনুপ্রবেশ ঘটছে। জাতিগত এবং ভাষাগত মিল থাকার জন্য বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। দিল্লির মতো জায়গায় এদের খুঁজে বের করা যতটা সহজ, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে এই চিহ্নিতকরণ ততটাই শক্ত।"[৬৪]

জ্যোতি বসুর নিবন্ধ থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আগে প্রধানত হিন্দুরাই বাংলাদেশ থেকে ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসত। কিন্তু ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে মুসলমানরাও ভারতে চলে আসতে থাকে। কেউ কেউ নিয়মমতো কাগজপত্র নিয়েই আসে। তারপর জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যায়। আবার কেউ কেউ বে-আইনীভাবে ভারতে প্রবেশ করে। তিনি লেখেন, "১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত মোট ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫২৯ জন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বি. এস. এফ. তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে ৬৮,৪৭২ জন হিন্দু এবং ১.৬৪,১৩২ জন মুসলমান। একই সঙ্গে মোবাইল টাস্কফোর্সসহ রাজ্য পুলিশ ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯২ সালের মে মাসের মধ্যে ২,১৬,৯৮৫ জন অনুপ্রবেশকারীদের ফিরিয়ে দিয়েছে। এদের

মধ্যে ৫৬,৩৪২ জন হিন্দু এবং ১,৬৯,৭৯৫ জন মুসলমান।"[৬৫] তিনি আরও বলেন, বি. এস. এফ.-এর 'জাল কেটে' ভারতে অনেকে ঢুকে পড়ছে। তাদের আটকানো দরকার। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব হচ্ছে না। মোবাইল টাস্কফোর্স বৃদ্ধি করে বেআইনী অনুপ্রবেশ বন্ধের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারত সরকারের ওপরে চাপ দিচ্ছে। তা সত্ত্বেও কার্যকর কিছু হয়নি।[৬৬] স্বভাবতই বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অধ্যাপক রায় বর্মন ও মুচকুন্দ দুবে এই বে-আইনী প্রবেশের বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করে কেবলমাত্র সেন্সাস রিপোর্ট এবং বৈধ পাসপোর্ট নিয়ে এসে যারা ফিরে যায়নি, সেইসব সংখ্যা নিয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। এখানেও দেখা যাবে, মুচকুন্দ দুবের সংগৃহীত সংখ্যার সঙ্গে জ্যোতি বসু কর্তৃক সরবরাহ করা সংখ্যার পার্থক্য। মুচকুন্দ দুবে লেখেন, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৪ থেকে ৫ লক্ষের বেশি বাংলাদেশী ভারতে প্রবেশ করেনি এবং তারা অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছে।[৬৭]

জ্যোতি বসু লেখেন, "১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ৩৩ লক্ষ ১৫ হাজার বাংলাদেশী তাদের নিয়মমাফিক বৈধ কাগজপত্র নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। এদের মধ্যে ২৭ লক্ষ ২৭ হাজার মানুষ প্রকৃতপক্ষে ভারত ত্যাগ করেছেন। ফলে এর থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় প্রায় ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার বাংলাদেশী তাদের ভিসার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও ভারতে বসবাস করছেন।"[৬৮] জ্যোতি বসু এই কথাও বলেন, "১৯৭১ সাল থেকে যাঁরা ভারতে এসেছেন, তাঁদের সংখ্যা প্রথমে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই সংখ্যাটি জানতে পারলে সমস্যাটির গভীরতা বুঝতে পারা অনেক সহজ হবে।"[৬৯]

মুখ্যমন্ত্রী বসুর এই নিবন্ধ থেকে বোঝা যাচ্ছে, কত সংখ্যক মানুষ ভারতে প্রবেশ করেছে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করার মতো তথ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে নেই। অথচ মুচকুন্দ দুবের মতো দায়িত্বশীল ব্যক্তি অনায়াসে বলে দিলেন ৪ থেকে ৫ লক্ষের বেশি বাংলাদেশী নাগরিক ভারতে প্রবেশ করেনি। প্রসঙ্গত জ্যোতি বসু বলেন, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে অসম সরকার ১২ হাজার বাস্তুহারাকে পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং তাদের জলপাইগুড়ি জেলায় শিবির করে রাখতে হয়। পুনরায় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে অসমের উত্তর লখিমপুর থেকে ৩৬টি পরিবারের ২০১ জন পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। তাছাড়া দার্জিলিং-এ আন্দোলন চলার সময়ে কিছু নেপালীকে পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে

৪৯৪টি বাংলাদেশী মৎস্যজীবী পরিবারের ২১২১ জনকে ওড়িশা থেকে পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[৭০]

কিভাবে অনুপ্রবেশ সমস্যার সম্মুখীন হওয়া যায় এবং 'পুশব্যাক' সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিও জ্যোতি বসু ব্যাখ্যা করেন। দিল্লিতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের সভায় তিনি বলেন, "সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশ বন্ধ করার এই হলো সঠিক সময়। এরজন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তাহলো, ভিসা আইনকে কড়া করা, ভিসা নিয়ন্ত্রণে কম্পিউটার চালু করা, বিদেশী আইন অনুসারে নথিভুক্ত করা। এগুলি প্রয়োগ করা গেলে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা কার্যকরীভাবে সম্ভবপর হয়। এর পাশাপাশি সীমান্তে বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীদের রুখতে হলে সীমান্তে বি. এস. এফ.-এর মোতায়েন আরও বৃদ্ধি করা উচিত। ইতিমধ্যেই সীমান্তবর্তী রাস্তা নির্মাণ এবং সীমান্তে কাঁটা তার দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই দুটি কর্মসূচিই অত্যন্ত জরুরী। তাই নির্দিষ্ট সময়মতো এই প্রকল্পের কাজ শেষ করার জন্য রাজ্য সরকার সমস্তরকম সহযোগিতা করবে। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো, ভারতের মধ্যে যে কোনও ধরনের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। এরই পাশাপাশি টহলদারি বাহিনীকে শক্তিশালী করতে হবে, যাতে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা যায়। আমরা এই বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনাতেও বসতে পারি।" মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা নির্ধারণ করার পরেই সমস্যার গভীরতা উপলব্ধি করা সম্ভব। তার ভিত্তিতে ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি আলোচনা করলে "এইসব মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ ও পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করা যাবে।" তিনি এই কথাও স্মরণ করিয়ে দেন, "এদের বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করা বা ফিরিয়ে দেওয়ার মানবিক দিকের কথাও মনে রাখতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "যদি কোনও রাজ্য সরকার বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করে, তাহলে তাদের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়ে দিলেই চলবে না। এই ব্যবস্থাটি অনুপ্রবেশ সমস্যার সমাধান হতে পারে না।"[৭১]

উত্তর-পূর্ব ভারতের কংগ্রেস (ই) নেতৃত্ব অনুপ্রবেশ সমস্যা সম্বন্ধে কি ভাবছে, তা দেখা যাক। ১৯৯২ ও ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে নর্থ ইস্টার্ন কংগ্রেস(ই) কো-অরডিনেশন কমিটির সপ্তম ও অষ্টম সম্মেলনে এখানকার সাধারণ সম্পাদকরা যে রিপোর্ট পেশ করেন, তা থেকে জানা যায়, অনুপ্রবেশ সমস্যা ও বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দুরবস্থা এই অঞ্চলের কংগ্রেস নেতৃত্বকে খুবই উদ্বিগ্ন করে

তুলেছে।[৭২] তাঁরা যে অধ্যাপক রায় বর্মনের অথবা মুচকুন্দ দুবের মন্তব্যের সঙ্গে একমত নন, তা এই দুটি রিপোর্ট থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁরা স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশে গিয়ে বসবাস করাকে ইতিহাসের স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে করলেও বাংলাদেশ থেকে গত সাড়ে চার দশক ধরে যেভাবে পূর্বাঞ্চলে জনসাধারণের প্রবেশ ঘটছে, তাকে তাঁরা অস্বাভাবিক বলেই মনে করেন। এইভাবে অনুপ্রবেশ হতে থাকলে সেখানকার সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হতে পারে, এমন আশংকাও তাঁরা ব্যক্ত করেন।[৭৩] বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে সরকারিভাবে কোনও নির্ভরযোগ্য সংখ্যা না পাওয়া গেলেও, এই অনুপ্রবেশ যে ঘটছে, তা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকার করেন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পার্লামেন্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী এম. এম. জেকব বলেন, একলক্ষ বাংলাদেশী নাগরিক দিল্লিতে এবং ৫·৮৭ লক্ষ পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে।[৭৪]

সম্প্রতি অনুপ্রবেশ সমস্যা রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি ডি. এন. চক্রবর্তীর মতে, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫ মিলিয়নের বেশি মানুষ বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম-বঙ্গে অনুপ্রবেশ করেছে।[৭৫] ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মতে, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রায় ৬ মিলিয়ন মানুষ প্রবেশ করে এবং কলকাতা শহরেই বাস করছে ১·২ মিলিয়ন অনুপ্রবেশকারী।[৭৬] কিন্তু কোন সূত্র থেকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বি. জে. পি. এই তথ্য সংগ্রহ করেছে, তা এই দুটি দলের নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেননি। বাংলা-দেশের সেন্সাস রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনা করে এবং পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ নতুন রেশন কার্ড বিলি করা হয়েছে, তা থেকে কেউ কেউ বলেন, গত দশকে ১০ মিলিয়ন অথবা ১০ থেকে ১৪ মিলিয়ন বাংলাদেশী ভারতে প্রবেশ করে। সঞ্জয় হাজারিকা স্পষ্ট করেই বলেন, ১০ থেকে ১৪ মিলিয়ন বাংলাদেশী ভারতে বসতি স্থাপন করেছে।[৭৭]

উত্তর-পূর্ব ভারতের অনুপ্রবেশ সমস্যা বিশ্লেষণে বাংলাদেশের জনসাধারণের দুরবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জনবিন্যাস-মানচিত্রের আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। অধ্যাপক রায় বর্মন ও মুচকুন্দ দুবে এই বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেননি। বাংলাদেশের প্রকৃত জনসংখ্যা কত এবং দেশত্যাগের মূল কারণ কি, এই সব প্রশ্ন আলোচনা না করে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। সম্প্রতি সঞ্জয় হাজারিকা যেসব তথ্য সংগ্রহ করেন, তা এই বিষয় নিয়ে আমাদের

ভাবতে যথেষ্ট সাহায্য করে।[৭৮] বাংলাদেশে ভূমির উপর অস্বাভাবিক চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ মানুষের দুরবস্থা প্রকট হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা নদীর উর্বর অববাহিকায় যে বিশাল সংখ্যক মানুষ বসবাস করে এবং অপরিসীম পরিশ্রম করে যে ফসল ফলায়, তা থেকে লাভবান হওয়ার কোনও সুযোগ তাদের নেই। তাদের উৎপন্ন সম্পদের বেশিরভাগ আত্মসাৎ করে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারী, গ্রামের মোড়ল, রাজনীতিবিদ ও সেনাবাহিনী। 'গ্রামীণ ব্যাঙ্কের' মতো কিছু পরিকল্পনা সফল হলেও এবং তার ফলে গ্রামের গরীবদের সুবিধা হলেও সামগ্রিকভাবে তাদের দুরবস্থা লাঘব হয়নি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক আগেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ মহাবব হোসেন-এর মতে, জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ধান ও পাটের ওপর নির্ভরশীল অর্থনীতি এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে।[৭৯] বহু মানুষকে খেতে দিতে হবে, কিন্তু খাদ্যের পরিমাণ ততটা নেই। অল্প পরিমাণ জমিতে বহু মানুষের ভিড়। প্রতি কিলোমিটারে জনবসতির ঘনত্ব ৭৮৫, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ১৭০ ডলারের কম বাৎসরিক মাথা পিছু আয় ধরলে বাংলাদেশ হলো পৃথিবীর একটি দরিদ্রতম দেশ। বাংলাদেশ মাথা পিছু আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করলেও, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ৫৮ শতাংশ গ্রামীণ শিশু এবং ৪৪ শতাংশ শহুরে শিশু ভয়ানকভাবে অপুষ্টিতে ভুগছে। প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার হলো ১১০, অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশেরও কম অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন। যদিও তিন-চতুর্থাংশ বালক-বালিকারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তাদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছানোর আগেই পড়াশুনা ছেড়ে দেয়।[৮০]

ডঃ মহাবব হোসেনের রচনা থেকে জানা যায়, প্রায় ৮০ শতাংশ কৃষিজমিতে ধান চাষ হয় এবং প্রায় ৬০ শতাংশ পুঁজি বিদেশী সাহায্য হিসেবে আসে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওযার ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, খামারের গড়পড়তা আয়তন এক হেক্টরেরও কম (অথবা ২ একরের কম)। নানা ধরণের খাদ্যশস্য উৎপাদনের আধুনিক ব্যবস্থা অবলম্বনের অভাবে, বন্যার ফলে ও সেচব্যবস্থা প্রসারিত না হওয়ায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যাহত হয়। তাছাড়া চাষের জমির অভাবও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবারগুলিতে জন্মের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাগাভাগিতে চাষের জমিরও সংকোচন হচ্ছে। তাই জমি থেকে আয়ের উৎস হ্রাস পাচ্ছে, ঋণের বোঝা বাড়ছে। বাংলাদেশে পরিবার

পরিকল্পনা কর্মসূচি কার্যকর হয়নি।[৮১] জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রয়াস যে সংগঠিত নয়, তা বিশ্বব্যাংকের মূল্যায়নে উল্লিখিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এমন প্রচার করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনায় বন্ধ্যাকরণের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল তার ৭০ ভাগ অর্জিত হয়েছে। ভুয়া তথ্যের ভিত্তিতে যে এই দাবি করা হয়, তা ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের তদন্তে প্রকাশিত হয়। আর এই ভুয়া তথ্য অবলম্বন করেই রাষ্ট্রপতি এরশাদকে জাতিসংঘের 'জনসংখ্যা পুরস্কার' দেওয়া হয়। অবশ্য পরে তদন্তের ফলে ভুয়া তথ্য সম্বন্ধে জানা যায়।[৮২] অধ্যাপক রায় বর্মন ও মুচকুন্দ দুবে তা খেয়াল করেননি।

বর্তমান বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের জনসংখ্যা সম্বন্ধে বাংলাদেশ পরিবার-পরিকল্পনা দপ্তরের এক হিসেব থেকে এই তথ্য পাওয়া যায় :[৮৩]

সাল	জনসংখ্যা
১৬৫০ খ্রিস্টাব্দ	১ কোটি
১৮৬০ ,,	২ কোটি
১৯৪০ ,,	৪ কোটি
১৯৭৭ ,,	৮ কোটি
১৯৯৩ ,, (মার্চ পর্যন্ত)	১২ কোটি ২০ লক্ষ

এমন আশংকাও ব্যক্ত হয় যে, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটি অতিক্রম করে যাবে।[৮৪] জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের নির্বাহী পরিচালক ড: নাফিস সাদিক ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে বলেন, বর্তমান জন্মহার অব্যাহত থাকলে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২৫ কোটি ৮০ লক্ষ হবে।[৮৫] উল্লেখ্য এই, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে 'জনসংখ্যা দিবস'-এর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বাংলাদেশের পরিবেশ ব্যবস্থা ১৩ কোটি মানুষ ধারণ করতে পারে। জনসংখ্যার এই সীমা ছাড়িয়ে গেলে বাংলাদেশ বড় ধরনের বিপদে পড়বে।"[৮৬]

আর একটি বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে যখন প্রথম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়, তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩ ধরে পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। এই সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৩ থেকে ২'৫ ভাগে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়। কিন্তু ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার হ্রাস

পেয়েছে, এমন কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। অথচ ১৯৮১-১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের সময়কালে বাংলাদেশ আদমশুমারি অনুযায়ী দেখা যায়, বাংলাদেশে যে পরিমাণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার কথা, তা থেকে প্রায় ১ কোটি জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। স্বভাবতই এই বিষয় নিয়ে সংবাদপত্রে আলোচনার সূত্রপাত হয় এবং তাতে এই জনসংখ্যাকে 'missing population' (হারিয়ে যাওয়া জনসংখ্যা) বলে উল্লেখ করা হয়। এই কারণেই ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে পৌঁছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.১৭ ধরা হলেও এর মধ্যে 'হারিয়ে যাওয়া জনসংখ্যা' বাদ দেওয়ায় বাংলাদেশে প্রকৃত জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটেনি। বাংলাদেশের জন্মহার, মৃত্যুহার এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির অগ্রগতি আলোচনা করলেই তা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে।[৮৭] বাংলাদেশের জন্মনিয়ন্ত্রণের কর্মসূচির সামগ্রিক দিক দিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ যে মতামত ব্যক্ত করেন, তাতেই বোঝা যায়, কেন এই কর্মসূচি ব্যর্থ হলো। বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির সভাপতি আলমগীর এম. এ. কবির, অধ্যাপক বরকত-এ-খোদা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী আব্দুর রউফ প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির ব্যর্থতা স্পষ্ট করেই উল্লেখ করেন।[৮৮] সুতরাং এই কর্মসূচি সফল হওয়ায় বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে, এমন দাবি করার কোনও কারণ নেই। তাছাড়া জন্মহার, মৃত্যুহার ও শিশু মৃত্যুহার থেকেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। ১৯৮১-১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের সময়কালে প্রতিহাজারে শিশু মৃত্যুর হার IMR (Infant Mortality Rate) সর্বোচ্চ ১২২ থেকে হ্রাস পেয়ে ৯১ হয়। একই সময়কালে প্রতি হাজারে স্বাভাবিক মৃত্যুহার CDR (Crude Death Rate) সর্বোচ্চ ১২.৩ থেকে হ্রাস পেয়ে ১১.০ হয়, আর স্বাভাবিক জন্মহার CBR(Crude Birth Rate) সর্বোচ্চ ৩৫.০ থেকে হ্রাস পেয়ে ৩১.৬ হয়, যদিও গত ১১ বছরে গড় জন্মহার ৩৪.২৪ এবং গড় মৃত্যুহার ১১.৭ থাকে। স্বভাবতই প্রকৃত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মোটেই হ্রাস পায়নি।[৮৯] আলোচনার সুবিধার জন্য এখানে বাংলাদেশ সরকারি সূত্র থেকে এই তথ্য উদ্ধৃত করা হলো :[৯০]

প্রতি হাজারে বাংলাদেশের জন্ম ও মৃত্যুহার :

বছর	জন্মহার	মৃত্যুহার
১৯৮১	৩৪.৯	১১.৫
১৯৮২	৩৪.৮	১২.২
১৯৮৩	৩৫.০	১২.৩

বছর	জন্মহার	মৃত্যুহার
১৯৮৪	৩৪'৮	১২'৩
১৯৮৫	৩৪'৬	১২'০
১৯৮৬	৫৪'৪	১১'৯
১৯৮৭	৩৩'৩	১১'৫
১৯৮৮	৩৩'২	১১'৩
১৯৮৯	৩৩'০	১১'৪
১৯৯০	৩২'৮	১১'৩
১৯৯১	৩১'৬	১১'০

প্রতি হাজারে শিশুমৃত্যুর হার :

১৯৮১	১৯৮২	১৯৮৩	১৯৮৪	১৯৮৫	
১১১'৫	১২১'৯	১১৮	১২২	১১২	
১৯৮৬	১৯৮৭	১৯৮৮	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯১
১১৬	১১৩	১১০	৯৮	৯৪	৯১

প্রশ্ন হলো : কি কারণে বাংলাদেশে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২'১৭ হয় ? ওপরে উল্লিখিত তথ্য থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, গত ১২ বছরে বাংলাদেশ থেকে ব্যাপকসংখ্যক জনসমষ্টির বহির্গমনের (migration) জন্যই জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার ২'১৭ দাঁড়ায়। বলাবাহুল্য, এই বহির্গমন ভারত রাষ্ট্রেই হয়। আর তা অনুপ্রবেশ সমস্যা হিসেবে উল্লিখিত হচ্ছে। অর্থনীতিবিদ আবু হোসেনের মতে, জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার হলো ২'৭ ; এই হার ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের বৃদ্ধির সমান। তা থেকে বোঝা যায়, গত ৩০ বছরে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার মোটেই হ্রাস করা সম্ভব হয়নি।[১১] বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি ও বে-সরকারি পারিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচির মাধ্যমে যেভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা চলছে, তাতে ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যার সীমা ১৫ কোটি আশা করা হলেও তা নিঃসন্দেহে অতিক্রম করে যাবে।[১২] উল্লেখ্য এই, প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়ার বিবৃতি উল্লেখ করে আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশের পরিবেশ-ব্যবস্থা ১৩ কোটির বেশি মানুষ ধারণ করতে পারে না। আমরা যদি বাংলাদেশের পরিবার-পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের মত মেনে নিই, তাহলে দেখা যাবে, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাংলাদেশে ২ কোটি মানুষ বাড়তি হবে, যাদের স্থান বাংলাদেশে হবে না। তাহলে তারা কোথায় যাবে ? এই জন-

সংখ্যা বৃদ্ধি শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নয়, ভারতের ক্ষেত্রেও ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। আর একটি বিষয়ের কথাও ভাবতে হয়। টমাস হোমার-ডিকশন ও তাঁর সহযোগীদের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মাথা-পিছু শস্যের জমির পরিমাণ ভয়ানকভাবে হ্রাস পাবে। ইতিমধ্যেই সংকট দেখা দিয়েছে। কারণ চাষের ভালো জমিগুলি বারে বারে চাষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে। মাথা পিছু ০.০৮ হেক্টর ধরা হলে দেখা যাবে, এখনই শস্যের জমি বিরল হয়েছে।[১৩]

বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরা এই কথাও বলেন, বারে বারে বন্যা বাংলাদেশের যে ক্ষতিসাধন করছে, তার ফলেও অসংখ্য মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে এবং অস্থায়ী ও স্থায়ীভাবে বহির্গমন ঘটছে। এই বহির্গমন শুধু এক জেলা থেকে আর এক জেলায় নয়, এমন কি আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করেও হচ্ছে। আতাউর রহমানের রচনায় এই বিষয়ে বিশদ তথ্য পাওয়া যায়। বন্যার ফলে জমির খুবই ক্ষতি হয় এবং শস্য উৎপাদনও হ্রাস পায়। কোনও কোনও সূত্র থেকে জানা যায়, প্রতি গ্রীষ্মেই বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল বন্যার জলে ঢাকা পড়ে যায়। স্বভাবতই জনসাধারণ অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়।[১৪] বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ উপকূল-প্রান্তও সমুদ্রের জলে ভেসে যায়। ঢাকার জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, প্রতি বছরই ১৮ থেকে ১৯ মিলিয়ন মানুষ বন্যার ফলে ক্ষতি-গ্রস্ত হয়। কিভাবে এই বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা নিয়ে সরকারি অথবা বে-সরকারি স্তরে কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। বন্যায় বিধ্বস্ত ৮.২৮ মিলিয়ন হেক্টর অঞ্চলের মধ্যে ১৯৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মাত্র ৩২ শতাংশ অঞ্চল বন্যা থেকে রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে এবং ৫.৭ মিলিয়ন হেক্টর অঞ্চল এখনও বন্যায় বিধ্বস্ত হবে। বাংলাদেশ সরকার নব্বই-এর দশকে ৪০ শতাংশ অঞ্চল বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার কথা ভাবছে। সুতরাং সরকারি তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর ৬০ শতাংশ অঞ্চল বন্যায় বিধ্বস্ত হবে, আর এই অঞ্চলের মানুষ দেশান্তর গমনে বাধ্য হবে।[১৫]

ওপরে উল্লিখিত কারণে বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু জনসমষ্টির মধ্যে একটি অংশের বহির্গমন ঘটছে। স্বাভাবিকভাবে সংখ্যার দিক থেকে সংখ্যা-গুরু মুসলিম জনসমষ্টি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সমগ্র জনসংখ্যার ৮৫ ভাগের বাস দারিদ্র্যসীমার নিচে, আর ৫৫ ভাগ ভূমিহীন। ১১ শতাংশ বাংলাদেশী পরিবারের মাথার ওপরে কোনও আচ্ছাদন নেই। তারা রাস্তার ধারে,

গাছের নিচে ও রেলওয়ে স্টেশনে বসবাস করে।[৯৬] স্বভাবতই জীবন-জীবিকার তাগিদে সংখ্যাগুরু মুসলিম জনসমষ্টি ভারতে প্রবেশ করে। অর্থনৈতিক কারণ থাকলেও, প্রধানত বৈষম্যমূলক আচরণ ও ধর্মীয় নিপীড়নের ফলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। কি ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা হচ্ছে, তার বিস্তৃত আলোচনা আমি অন্যত্র করেছি।[৯৭] ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ফলে জমির ওপরে অস্বাভাবিক চাপ পড়ছে। মাথা পিছু জমির পরিমাণ প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে পেঁছেছে। দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার কোনও সম্ভাবনা নেই। তা করবার কোনও কার্যকর কর্মসূচি অথবা ক্ষমতা বাংলাদেশ সরকারের নেই। এই বিষয়ে বড় রাজনৈতিক দলগুলিও উদাসীন।[৯৮] তারফলে সংখ্যাগুরু মুসলিম জনসমষ্টির সামনে দুটি পথ খোলা রয়েছে : বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের জমিজমা দখল করা, আর ভারতে প্রবেশ করে নতুন করে জীবিকার সন্ধান করা। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যেসব বৈষম্যমূলক আইন বাংলাদেশে প্রয়োগ করা হয়েছে, তারফলে সংখ্যালঘুরা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা যেভাবে নির্যাতন ও দাঙ্গার শিকার হয়, তার বিস্তৃত আলোচনা করলেই বোঝা যায়, কেন সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয় ; আর কিভাবে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে দাঙ্গাকারীরা হিন্দুদের উৎখাত করে বাড়ি ঘরদোর জমি-জমা সব দখল করে, তার ছবিটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আইনের শাসন না থাকায় এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন দুর্বল হওয়ায় নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে সংখ্যালঘুদের সহজেই বিতাড়ন করা যায়। সংখ্যালঘুদের তো প্রতিরোধের কোনও ক্ষমতা নেই। তাই বাংলাদেশে দাঙ্গার চরিত্রও পালটে গেছে। সংখ্যাগুরু মুসলমানদের একটি অংশ সংখ্যালঘুদের জমি-জমা দখল করে যেমন তাদের 'ভূমি লালসা' চরিতার্থ করছে, তেমনি অন্যদিকে আর একটি অংশ ভারতে প্রবেশ করে তাদের জীবিকার সন্ধান করছে। বলা বাহুল্য, এইসব কারণে বাংলাদেশ দ্রুত তার বহু ধর্মীয় রাষ্ট্রিক চরিত্র হারিয়ে ফেলছে।[৯৯] তারফলে বাংলাদেশের জনবিন্যাস-মানচিত্র কিরূপ ধারণ করছে তা দেখা যাক। এই বিষয়েও বিস্তৃত আলোচনা আমি অন্যত্র করেছি।[১০০] তাই সংক্ষেপে কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করছি। পশ্চিম বঙ্গের ও ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যসমূহের জনসংখ্যার চিত্রটি আগেই আমি আলোচনা করেছি। বাংলাদেশের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি জানা থাকলে আমরা তুলনামূলক আলোচনা করতে পারব। ধর্ম অনুযায়ী

বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার শতকরা হার এখানে বাংলাদেশের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত করা হলো :[১০১]

সেন্সাস বছর	মুসলিম	হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রিস্টান	অন্যান্য
১৯৪১	৭০·৩	২৮·০	—	০·১	১·৬
১৯৫১	৭৬·৯	২২·০	০·৭	০·৩	০·১
১৯৬১	৮০·৪	১৮·৫	০·৭	০·৩	০·১
১৯৭৪	৮৫·৪	১৩·৫	০·৬	০·৩	০·২
১৯৮১	৮৬·৬	১২·১	০·০	০·৩	০·৩

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ থেকে মুসলিম জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে একই সময়কালে হিন্দু জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। বৌদ্ধ জনসংখ্যাও হ্রাস পায়। বাংলাদেশের সেন্সাস রিপোর্টে হিন্দু-জনসংখ্যা হ্রাস পাবার কারণ হিসেবে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত বিভাগ, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত-পাক যুদ্ধ এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধ উল্লেখ করা হয়েছে ; অন্য কোনও কারণ উল্লেখ করা হয়নি। এই সময়কালে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলাতেই হিন্দু-জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হ্রাস পায়। জেলা অনুযায়ী মুসলিম ও হিন্দু জনসংখ্যার বিষয়ে আমার একটি পুস্তিকায় আলোচনা করেছি। এইসব তথ্যের সঙ্গে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে সংগৃহীত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের জনগণনার তুলনামূলক আলোচনা করলে ছবিটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।[১০২] বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামীকরণের ও সামরিকীকরণের নীতি কার্যকর করায় বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রিস্টান উপজাতির বহু সংখ্যক অধিবাসী তাদের নিজেদের বাসভূমি ত্যাগ করে ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচল রাজ্যে আশ্রয় নেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র সংঘাত ঘটে। উদ্বাস্তু উপজাতি জনগোষ্ঠীর দায়ভার ভারতকে বহন করতে হচ্ছে। এই বিষয়েও অন্যত্র আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি।[১০৩] বাংলাদেশ থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতে বহির্গমনের প্রথম আধা-সরকারি স্বীকৃতি পাওয়া যায় শরীফা বেগমের অনুসন্ধান থেকে। তিনি এই কথাও বলেন, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের পরে বহির্গমনের সংখ্যা না পাওয়া গেলেও বহির্গমন যে বন্ধ হয়নি, তা নিশ্চিত করে বলা যায়। তিনি বলেন, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বহির্গমন ও দুর্ভিক্ষের ফলে উল্লেখযোগ্য জনসমষ্টি বাংলাদেশ হারায়। ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। তখন বহুসংখ্যক মানুষ ভারতে প্রবেশ করে।[১০৪] মার্কাস ফান্ডা বলেন, সত্তরের দশকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে বহির্গমন বৃদ্ধি পায়। তিনি

বলেন, ভারত সরকারের সূত্র থেকে জানা যায়, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ থেকে অসম রাজ্যে আগমনকারীদের সংখ্যা ৬ লক্ষেরও বেশি হবে, ৩ লক্ষেরও বেশি মেঘালয়ে এবং ২ লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে নদীয়া জেলার মোট ৩০ লক্ষ অধিবাসীর অর্ধেকেরও বেশি ছিল বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তু।[১০৫]

প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, বাংলাদেশ থেকে যে বহুসংখ্যক মানুষ ভারতে প্রবেশ করেছে, এই বিষয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে এখানে তথ্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হলো এই যে, বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী বেগম জিয়া স্পষ্ট করেই বলেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতে কোনও 'অবৈধ অনুপ্রবেশ' ঘটেনি। তাই ভারত থেকে কাউকে 'পুশব্যাক' করে পাঠালে বাংলাদেশ তাদের গ্রহণ করবে না। শুধু তিনি নন, বাংলাদেশের ধর্মীয় মৌলবাদীরাও "বাংলাভাষী ভারতীয় মুসল-মানদের বলপূর্বক বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার ভারতীয় অপচেষ্টার" তীব্র নিন্দা করেছে।[১০৬] আরও বিস্মিত হতে হয়, এই দেখে যে, মুচকুন্দ দুবে বাংলাদেশ সরকারের এই মনোভাব সমালোচনা না করে প্রধানমন্ত্রী কি কারণে এই অনুপ্রবেশ প্রকাশ্যে মেনে নিতে পারেননি, তার ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন, কোনও নেতার পক্ষেই প্রকাশ্যে এই ধরনের অনুপ্রবেশ মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।[১০৭] উল্লেখ্য এই, অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী জিয়া ও বাংলাদেশের মৌলবাদীরা একই ধরনের মনোভাব ব্যক্ত করেন। এই ধরনের মনোভাবের সঙ্গে বাংলাদেশে আর একটি তত্ত্বও সম্প্রতি প্রচারিত হচ্ছে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসমষ্টি যাতে অবাধে ভারতে প্রবেশ করতে পারে, তার জন্য বাংলাদেশের একটি মহল থেকে 'লেবেনস্রাউম' (Lebensraum) তত্ত্ব প্রচার করা হচ্ছে। 'লেবেনস্রাউম' শব্দের অর্থ হলো 'বসবাসের স্থান' (Living space)। হিটলার তাঁর রচিত 'মাইন ক্যাম্ফ' (Mein Kampf) গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি জার্মানদের জন্য 'বৃহত্তর বাসভূমির দাবি' উত্থাপন করতে গিয়ে এই জার্মান শব্দটি চয়ন করেন। তিনি 'লেবেনস্রাউম' শ্লোগান আউড়ে যুদ্ধের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেন। ঢাকার ইংরেজি সাপ্তাহিক 'হলিডে' পত্রিকায় বাংলাদেশীদের জন্য বৃহত্তর বাসভূমির দাবিটিকে রূপদানের উদ্দেশ্যে 'লেবেনস্রাউম' প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত সাদেক খান লিখিত প্রবন্ধটি পড়লেই বোঝা যায়, কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই তত্ত্ব প্রচার করা।[১০৮]

বহু বছর ধরে বাংলাদেশীদের ভারতে অনুপ্রবেশের ফলে উত্তর-পূর্ব

ভারতের এবং পশ্চিমবঙ্গের জাতি, ভাষা, ধর্ম, অর্থনীতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ সরকারের মনোভাব হলো, আন্তর্জাতিক সীমানা আইনের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে অন্যদেশে যাতে বাংলাদেশীরা জীবিকার সন্ধানে যেতে পারে, তারজন্য কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা। কিন্তু ভারত সরকার অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক মনে করে। তা সত্ত্বেও ভারত সরকার কিন্তু অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেনি।[১০৯] বাংলাদেশ সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে সেখানে যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হয়ে ভারতে প্রবেশ করতে বাধ্য হচ্ছে, তার জন্যও বাংলাদেশ সরকারের ওপরে ভারত সরকার কোনও চাপ সৃষ্টি করে এই নির্যাতন বন্ধ করতে সক্ষম হয়নি। এই উপলব্ধিও ভারত সরকারের হয়নি যে, বাংলাদেশ যদি দ্রুত বহুধর্মীয় রাষ্ট্রিক চরিত্র হারিয়ে ফেলে এবং সংখ্যালঘু জনসমষ্টির ভারতে আগমন ঘটতে থাকে, তাহলে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বিপর্যস্ত হবে। তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুধু ভারতে নয়, বাংলাদেশেও ঘটবে। উভয় রাষ্ট্রেই হিন্দু ও মুসলিম ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থাকে দুর্বল করে ফেলবে। উভয় রাষ্ট্রে ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের অভ্যুত্থান তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।[১১০] দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশ থেকে অগণিত মানুষ অসম রাজ্যে প্রবেশ করে বসতি স্থাপন করায় এই রাজ্য এখন জাতিগত ও সম্প্রদায়গত বিরোধের এক উর্বর ক্ষেত্রভূমিতে পরিণত হয়েছে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ছাত্র-আন্দোলনে তা লক্ষ্য করা যায়।[১১১] ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ৫ হাজার সাধারণ নিরীহ মানুষ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বলি হলো। সবচেয়ে জঘন্য হত্যাকাণ্ড হলো অসম রাজ্যের নওগাঁও জেলার নেলী নামক এক অজানা গ্রামে। এখানে বহু মুসলমান পাশবিকতার শিকার হয়।[১১২] ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের বি. ডি. আর. এবং সামরিক বাহিনীর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে লোগাংয়ের চাকমা 'শান্তিগ্রামে' নারকীয় হত্যাকাণ্ডে বহুসংখ্যক চাকমা বৌদ্ধ নিহত হয়।[১১৩] ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস সাধনের পরে ভারত ও বাংলাদেশে পরিস্থিতি ভয়ানক জটিল হয়। ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের আঘাতে সাধারণ নিরীহ মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ৭-৮ ডিসেম্বর নগাঁওয়ের নিকটবর্তী হোজাই মহকুমায় হিংসাত্মক ঘটনাবলির শিকার হয় বাঙালী

হিন্দুরা। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মণিপুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উদ্বেগ-জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।[১১৪]

বাংলাদেশসহ সমগ্র উত্তর-পূর্বভারতের জনবিন্যাস-মানচিত্রের দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখতে পাব, এই অঞ্চলের জনসমষ্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হলো মুসলমান। মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় অযথা শংকিত হওয়ার কোনই কারণ নেই। উভয় রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে যদি শান্তিপূর্ণ সহা-বস্থানের পরিবেশ বিঘ্নিত হয়, তাহলেই উদ্বেগবোধ করতে হয়। উল্লেখ্য এই, ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটলেও এখনও এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি, যারফলে মুসলিম জনবসতির স্থানগুলি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হওয়ায় তারা প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে প্রবেশ করতে বাধ্য হচ্ছে; আর এই বহির্গমনের ফলে ভারতের মুসলিম জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বস্তুত নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতের সেকুলার মডেলটি আইনের শাসনের মাধ্যমে ভারতের বহু ধর্মীয় রাষ্ট্রিক চরিত্রকে অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছে। একই সঙ্গে বহুমুখী সাংস্কৃতিক চেতনাও অক্ষুন্ন রয়েছে। বাম ও গণতান্ত্রিক দলসমূহ এই মডেলটি সংরক্ষণ করতে ও তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে বদ্ধপরিকর। তাই তাদের ধর্মান্ধ হিন্দু মৌলবাদীদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তার ফলে হিন্দু মৌলবাদীরা ভারতীয় সংবিধানকে বিকৃত করে এখনও হিন্দুধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম করতে সক্ষম হয়নি। সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি সংহত ও ঐক্যবদ্ধ থাকলে তা করা তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব হবে না। স্বভাবতই এই অবস্থায় ভারতের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দায়িত্ব রয়েছে, তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের বিচ্ছিন্ন করে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা। একই সঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের সম্বন্ধে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মানুষকে সচেতন করা। ভারতের সংখ্যাগুরু ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক মনে রেখেও সংখ্যালঘু ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের ভূমিকা সম্বন্ধেও জনসাধারণকে সচেতন করা দরকার। কারণ এই দু'ই মৌলবাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হলো ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। আর একটি কথাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। ভারতে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হলেও বাংলাদেশসহ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু। বাংলাদেশে যেভাবে ইসলামের প্রকৃত আধ্যাত্মিক নৈতিকতার আদর্শ বিকৃত করে ধর্মান্ধ মৌল-বাদীরা এক ভয়ানক অসহিষ্ণু হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলেছে এবং 'ইসলামী নেতৃত্ব সৃষ্টি' করে বাংলাদেশে 'ইসলামী আদর্শকে'

বাস্তবে রূপ দেবার জন্য উদ্যোগী হয়েছে, তাতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ প্রায়-বিধ্বস্ত হতে চলেছে। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করার পরে সেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছে। নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ভারতে প্রবেশ করতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলাদেশের বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ বাহাত্তরের সংবিধানের আদর্শ অনুযায়ী দেশ গঠনে প্রয়াসী হলেও তারা এখনও এমন শক্তিশালী নয় যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাদান করতে পারে। প্রধানত ধর্মীয় নির্যাতনের ফলেই যে সংখ্যালঘুরা বাংলাদেশ থেকে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে, তা কি কারণে মুচকুন্দ দুবের মতন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অগ্রাহ্য করেন, তা অনুধাবন করা কষ্টকর। তবে মুসলমানরা মুখ্যত অর্থনৈতিক কারণে চলে আসছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অবশ্য মুচকুন্দ দুবে এই কথা স্বীকার করেন, বাংলাদেশ থেকেই ভারতে একতরফা বহির্গমন ঘটছে। কিন্তু কেন ঘটছে, তার গভীরে তিনি প্রবেশ করেননি। তাছাড়া তিনি এই বহির্গমনের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের কোনও 'দুরভিসন্ধিপূর্ণ খেলা' রয়েছে বলে মনে করেন না। তাহলে কি করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের বিষয়টি অস্বীকার করা, ওখানকার ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের এই বিষয়ে মনোভাব এবং বিশেষ এক মহল থেকে বাংলাদেশের বাড়তি জনসাধারণকে ভারতের দিকে ঠেলে দেবার প্রয়োজনে 'লেবেনস্রাউম তত্ত্ব' প্রচার ইত্যাদির যথার্থ ব্যাখ্যা করা যায়? এই সমস্যাটিকে স্বীকার করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করাই কি বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সঙ্গত কাজ হতো না? মুচকুন্দ দুবে এই কথাও বলেন, এই সেদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা করে। কিন্তু একই সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার এমন কোনও পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সক্রিয় কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে কিনা, যাতে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নিরাপদ বোধ করতে পারে? বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরে বাংলাদেশ সরকার তার নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু ভারতের এই নিন্দাজনক ঘটনার পরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে দাঙ্গা হয়, তার নিন্দা করে কোনও প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশ সরকার অনুভব করেনি।[১১৫] এমনকি সরকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রক্ষার জন্য কোনও কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থাও অবলম্বন করেনি। মুচকুন্দ দুবে ভারতের ধর্মান্ধ হিন্দু মৌলবাদীদের সমালোচনা করেছেন। এই বিষয়ে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার

পক্ষপাতী ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে একমত হবেন। কিন্তু পরিস্থিতির সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে হলে বাংলাদেশের ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের ভূমিকাটির প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। তা না হলে উভয় রাষ্ট্রের ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের বিচ্ছিন্ন করে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনকে শক্তিশালী করা সম্ভব হবে না। ভারত ও বাংলাদেশ উভয় রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র সার্বভৌম অস্তিত্ব অটুট রেখেই পারস্পরিক সু-সম্পর্কের স্বার্থে সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটি দেখলে চলবে না। 'পুশ ব্যাক' সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যেভাবে আলোচনা করেন, তা অনেক সঙ্গত মনে হয়। কিন্তু যে পদ্ধতিতে ভারত থেকে 'পুশ ব্যাক' শুরু হয়েছিল, তা গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে নিন্দনীয় বলেই মনে হয়েছে। মুচকুন্দ দুবে তা খেয়াল করেননি। তিনি তাঁর নিবন্ধে বি. জে. পি-র 'মুখোশ খুলে দিতে' গিয়ে অনুপ্রবেশ সমস্যার বিপদকে লাঘব করে দেখে যেভাবে বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে মন্তব্য করেন, তাতে এই বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে দায়িত্ব এড়ানো অনেক সহজ হবে। মুচকুন্দ দুবে মস্তবড় একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হননি। তাহলো, বাংলাদেশ যেভাবে দ্রুতগতিতে বহু ধর্মীয় রাষ্ট্রিক চরিত্র হারিয়ে ফেলছে, তাতে কি স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশে ও ভারতে ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের হাত শক্ত হবে না? আর তার তীব্র প্রতিক্রিয়া কি পূর্বাঞ্চলের ভারতীয় রাজ্যগুলির ওপরে পড়বে না? ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা বাংলাদেশে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে, সে বিষয়ে বাম-গণতান্ত্রিক দলগুলিকে আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন: কারণ ওখানকার ধর্মান্ধ মৌলবাদী ভাবধারা বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশের মাধ্যমে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে পড়লে তাকে প্রতিহত করা বাম-গণতান্ত্রিক দলগুলির পক্ষে কষ্টকর হবে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন ঘটনাবলীতে তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভারতের ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া যেমন বাংলাদেশে পড়ে, তেমনি বাংলাদেশের ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়াও এখানে লক্ষ্য করা যায়। এই পরিস্থিতিতে ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অগ্রগামী অংশের ও বাম গণতান্ত্রিক শক্তির দায়িত্ব অপরিসীম। হিন্দুত্ববাদীরা যাতে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বিপর্যস্ত করতে না পারে, তার জন্য তাদের নিরন্তর প্রয়াসী হওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে বাম-গণতান্ত্রিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অগ্রগামী অংশকেও উপলব্ধি করতে হবে, বাংলাদেশসহ ভারতের পূর্বাঞ্চলে বাংলাভাষী মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসমষ্টির মধ্য থেকে যদি ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের আদর্শকে

কার্যকর রূপ দেবার জন্য নেতৃত্ব গড়ে না ওঠে, তাহলে এই সমগ্র অঞ্চলকে হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রভাব থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে অগ্রসর চিন্তার বুদ্ধিজীবী ও বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি ওখানে গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করার জন্য সংগ্রাম করে চলেছেন। কিন্তু ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা এমনভাবে তাদের শক্তি সংহত করেছে, যে-অদূর ভবিষ্যতে তাদের কতটা বিচ্ছিন্ন ও শক্তিহীন করা যাবে, তা বলা সম্ভব নয়। এই অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মের মানুষ যাতে নিজ নিজ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে পারস্পরিক প্রীতি-সহযোগিতার ভাব নিয়ে বসবাস করতে পারে, তারজন্য উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি না পেলে ভারতের পূর্বাঞ্চলের পরিস্থিতি যে জটিল থেকে জটিলতর হবে, তা বলাই বাহুল্য।

সূত্র নির্দেশ

১ Muchkund Dubey : **Inept handling of a Sensitive Issue**, in **Hindu**, December 9, 1992 ; **Muchkund Dubey : B J P & Illegal Migration From Bangladesh**, in **People's Democracy**, May 30, 1993 ; Arun Shourie : **Infiltrators : Entangling the Country, in The Sentinel**, May 7, 1993 ; B. K. Roy Burman : **Bangladeshi Issue in Perspective**, in **Mainstream**, April 24, 1993 ; Sanjoy Hazarika : **Bangladesh and Assam : Land Pressures, Migration and Ethnic Conflict**, in **The Sentinel**, Guwahati, June 5 and June 12, 1993 ; Jogesh Ch. Bhuyan, **A Demographic Analysis of the Population of Assam**, in **The Sentinel**, July 10 and July 17, 1993

২,৩ অমলেন্দু দে : **বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনবিন্যাস-মানচিত্রে পরিবর্তন**, দ্র. **পরিচয়**, মে-জুলাই, ১৯৯২

৪ Thomas Sowell : **Ethnic America A History**, New Delhi, 1991

৫ Muchkund Dubey : **B J P & Illegal Migration From Bangladesh**, op. cit.

৬ Amalendu De : **The Muslims As a Distinct Factor in Assam Politics (1826-1847)**, in **Bengal Past and Present**, **No. 183**, July-December, 19/7

৭-১৫ প্রাগুক্ত

১৬-২২ অমলেন্দু দে : **বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ**, কলিকাতা, ১৯৭৪

২৩-২৫ অমলেন্দু দে : **ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা**, কলিকাতা, ১৯৯২

২৬-৪৪ B. K. Roy Burman, op. cit.

৪৫ Ibid. অধ্যাপক রায় বর্মণ তার প্রবন্ধে জনবসতির ঘনত্ব প্রতি ২ কিলোমিটার ধরেছেন। আমার মনে হয়েছে, এখানে মুদ্রণ ত্রুটি ঘটেছে, হবে প্রতিবর্গ কিলোমিটারে। এই অংশে যে তথ্যগত ত্রুটি রয়েছে তা নিবন্ধের মূল অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৬ Ibid ; See also **Statistical Pocket Book of Bangladesh 92**, Dhaka, December, 1992 ; Bimal Pramanik : **Demographic Scenario in Bangladesh : An Evaluation, July, 1993**
বিমল প্রামাণিক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে সক্ষম দম্পতির সংখ্যা হলো ২ কোটি ২০ লক্ষ, তাদের মধ্যে ১ কোটি ৫০ লক্ষ এখনও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেনি। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণকারী সক্ষম মহিলাদের প্রজনন হার হলো ৪.৩ অর্থাৎ প্রত্যেক মহিলা গড়ে কমপক্ষে চার সন্তানের মা হচ্ছেন। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বাইরে সক্ষম দম্পতিদের প্রজনন হার আরও বেশি। বিমল প্রামাণিক : Report of the Task Forces on **Bangladesh Development Strategies for the 1990's vol. I, UPL**, Dhaka, **Bangladesh Population Census, 1981, দৈনিক সংবাদ, আজকের কাগজ** ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর নিবন্ধটি লিখেছেন।

৪৭-৫৪ T. V. Rajeswar. **Across the Border-1 Serious Influx From Bangladesh, in The Statesman**, April 6, 1990 ; **Across the Border-11 Census to Avert Communal Friction**, **in The Statesman, April 7, 1990,**

৫৫ Muchkund Dubey : **Inept handling of a Sensitive Issue, in Hindu,** December 9, 1992.

৫৬-৫৮ Muchkund Dubey : **BJP & Illegal Migration From** Bangladesh, op. cit.

৫৯ Ibid. See also T.V. Rajeswar, op. cit.

৬০ Ibid. উল্লেখ্য এই, পিপলস ডিমোক্র্যাসিতে প্রকাশিত মুচকুন্দ দুবের প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ ২২ জুলাই, ১৯৯৩ গণশক্তি কাগজে বের হয় **'বিজেপি এবং বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ'** এই শিরোনামায়। কিন্তু তাতে একটি মুদ্রণ ত্রুটি ঘটেছে। মুচকুন্দ দুবে তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধে ৭ থেকে ১০ মিলিয়ন মানুষের তফাত রয়েছে লিখেছেন। কিন্তু গণশক্তি কাগজে ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ মুদ্রিত হয়েছে। (দ্র. গণশক্তি, ২২ জুলাই, ১৯৯৩)

৬১ Muchkund Dubey : **BJP & Illegal Migration From Bangladesh,** op. cit.

৬২ Muchkund Dubey : **Inept handling of a Sensitive Issue,** op. cit.

৬৩ Ibid. মুচকুন্দ দুবে এই প্রবন্ধের শেষে লেখেন : "Migration is going to be a major international issue by the turn of the century and beyond. Both India and Bangladesh have a great deal at stake in this issue. They should, therefore, co-operate and co-ordinate for safeguarding their interest." (Ibid); see also his article **BJP & Illegal Migration From Bangladesh,** op. cit.

৬৪ জ্যোতি বসু : **অনুপ্রবেশ সমস্যার প্রকৃত সমাধান প্রয়োজন।** দ্র. গণশক্তি, ১১ অক্টোবর, রবিবার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা চার। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রবন্ধের জন্য পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

৬৫-৭১ প্রাগুক্ত

৭২ **Report of the General Secretaries** (**1st March, 1989 to 2nd July, 1992**), To the Seventh General Conference of the North Eastern Congress (I) Co-ordination Committee, Guwahati, 3rd July, 1992; **Report of the General Secretaries,**

To the Eighth General Conference (Special) of the North Eastern Congrees (I) Co-ordination Committee, at Dimapur, Nagaland, 22nd June, 1993.

৭৩ প্রাগুক্ত

৭৪ অমলেন্দু দে : **বাংলাদেশের জনবিন্যাস ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমস্যা**, কলিকাতা, ১৯৯২

৭৫-৭৭ প্রাগুক্ত

৭৮ Sanjoy Hazarika : **Bangladesh and Assam : Land Pressures, Migration and Ethnic Conflict**, op. cit.

৭৯-৮১ প্রাগুক্ত

৮২ **দৈনিক সংবাদ**, ঢাকা, ৬,৯-১৩ এপ্রিল, ১৯৯৩ ঢাকা থেকে প্রকাশিত। এই দৈনিক সংবাদপত্রে এই বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

৮৩ **দৈনিক সংবাদ**, ঢাকা, ৬ এপ্রিল ১৯৯৩ ; আবু আহমেদ : **জনসংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের সব হিসেবকেই গরমিল করে দিচ্ছে। দৈনিক সংবাদ** ৩১ মে, ১৯৯৩।

৮৪-৮৬ প্রাগুক্ত, ৬ এপ্রিল, ১৯৯৩

৮৭ প্রাগুক্ত, ৬, ৯ এপ্রিল, ১৯৯৩

৮৮ প্রাগুক্ত, ১৩ এপ্রিল, ১৯৯৩

৮৯ **Report of the Task Forces on Bangladesh Development Strategies For the 1990's, vol. 1, UPL, Dhaka**

৯০ **Bangladesh Popoulation Census, 1981, p 141 ; Statistical Pocket Book of Bangladesh, 1992** ; Bimal Pramanik, op. cit.

৯১ **দৈনিক সংবাদ**, ঢাকা, ১০ এপ্রিল, ১৯৯৩

৯২ **Report of the Task Forces on Bangladesh**, op. cit ; **Statistical Pocket Book of Bangladesh**, 1992, op. cit ; Bimal Pramanik, op. cit.

৯৩ Sanjoy Hazarika, op. cit. ; see also Thomas Homer-Dixon, Jeffrey Bontwell and George Rathjens : **Environmental change and Violent Conflict, Scientific American, February,** 1993, p. 40. সঞ্জয় হাজারিকা এই প্রবন্ধ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন।

৯৪ Ataur Rahman : **Impact of Riverbank Erosion : Survival**

Strategies of Displaces p. 11. সঞ্জয় হাজারিকা আতাউর রহমানের রচনাও ব্যবহার করেন। আতাউর রহমানের মতে, "The displaces of the riverbank erosion are the most wretched of the landless poor." (Ibid) ভারতীয় সাংবাদিক B. G. Verghese এই বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি লেখেন, বাংলাদেশের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি পায়। (দ্র. B. G. Verghese : **Waters of Hope**, New Delhi, 1991)

৯৫ John R. Rogge : **Riverbank Erosion, Flood and Population Displacement in Bangladesh**, p. 35 ; see also Sanjoy Hazarika, op. cit. সঞ্জয় হাজারিকা এই সূত্র ব্যবহার করেন।

৯৬ **দৈনিক সংবাদ**, ঢাকা, ৬ এপ্রিল, ১৯৯৩ ; দ্র. অমলেন্দু দে : **বাংলাদেশের জনবিন্যাস ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমস্যা**।

৯৭ অমলেন্দু দে : **বাংলাদেশের জনবিন্যাস ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমস্যা** ; অমলেন্দু দে, **অনুপ্রবেশ সমস্যার বিভিন্ন দিক, সংবাদ প্রতিদিন**, ৩০-৩১ অক্টোবর, ১৯৯২

৯৮ **দৈনিক সংবাদ**, ঢাকা, ১৩ এপ্রিল, ১৯৯৩

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে সার্ক অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতে এসকাপ (ESCAP) সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় :

দেশ	মোট দশমিক জন্মহার
ভারত	৩১.৫
নেপাল	৩৮.০
ভুটান	৩৮.৩
বাংলাদেশ	৪১.৪
পাকিস্তান	৪৪.৪

দেশ	জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক হার
ভারত	১.৯
নেপাল	২.৬
ভুটান	২.২
বাংলাদেশ	২.৫
পাকিস্তান	৩.১ (বহির্গমন ধরলে হবে ৩.২৮)

(দ্র. **আজকের কাগজ**, ঢাকা, ১০ এপ্রিল, ১৯৯৩)

৯৯-১০২ অমলেন্দু দে : **বাংলাদেশের জনবিন্যাস ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমস্যা।**

১০৩ প্রাগুক্ত ; দ্র. অমলেন্দু দে : **পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি জনগোষ্ঠী ও বাংলাদেশ সরকার। সংবাদ প্রতিদিন**, রবিবার ৪ জুলাই, ১৯৯৩

১০৪ Sanjoy Hazarika, op. cit.

১০৫ Ibid ; Marcus Fanda : **Bangladesh : The First Decade,** p. 235. সঞ্জয় হাজারিকা এই সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন।

১০৬ অমলেন্দু দে : **অনুপ্রবেশ সমস্যার বিভিন্ন দিক। সংবাদ প্রতিদিন**, ৩০-৩১ অক্টোবর, ১৯৯২

১০৭ Muchkund Dubey, op. cit.

১০৮-১১০ অমলেন্দু দে : **বাংলাদেশের জনবিন্যাস ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমস্যা**

১১১-১১২ Sanjoy Hazarika, op. cit.

১১৩ অমলেন্দু দে : **বাংলাদেশের জনবিন্যাস ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সমস্যা**

১১৪ **The Statesman**, Calcutta, July 22, 1993 ; **The Sentinel,** Guwahati, July 21, 1993 ; **সময় প্রবাহ**, গৌহাটি, ১৬-১৮ জানুয়ারি ১৯৯৩

১১৫ ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর ভারতে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার পরে বাংলাদেশে ডিসেম্বর মাসে যে-ধ্বংসকার্য চলে, তার বিষয়ে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য রচনা ও তথ্য প্রকাশিত হয়। তাছাড়া বাংলাদেশ পার্লামেন্টে যে-প্রস্তাবটি গৃহীত হয়, তাও দ্রষ্টব্য।

উপজাতি জনগোষ্ঠী ও বাংলাদেশ সরকার

দীর্ঘকাল ধরেই পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা শরণার্থীদের বিষয়ে ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলছে। কিন্তু এখনও ত্রিপুরার শিবিরে আশ্রয়গ্রহণকারী ৫৬,০০০ চাকমা শরণার্থীদের ফেরত পাঠানোর কোনও কার্যকর ব্যবস্থা হয়নি। তাছাড়া অরুণাচল প্রদেশে বসবাসকারী ৪০,০০০ চাকমা শরণার্থীদের ফেরত পাঠানোর জন্যও অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনী ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি-স্থাপনকারী বাঙালী মুসলমানদের অত্যাচারের ফলে উপজাতি জনগোষ্ঠী মানুষ বাস্তুচ্যুত হন। এইসব শরণার্থীদের কাছ থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তা খুবই হৃদয়বিদারক। ডেনমার্কে প্রতিষ্ঠিত 'চিটাগং হিল ট্রাকটস কমিশন' পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করে 'জীবন আমাদের নয়' এই শিরোনামায় একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাতে সেখানে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও সরকার কর্তৃক কিভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কেন চাকমা শরণার্থীরা বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতির ওপরে নির্ভর করে ফিরে যেতে ভরসা পান না, সেবিষয়েও কমিশনের রিপোর্ট থেকে স্বচ্ছ ধারণা করা যায়।

বাংলাদেশ সরকার কমিশনের রিপোর্ট আপত্তিজনক মনে করলেও বাংলাদেশ পার্লামেন্টের বিরোধী নেতৃবৃন্দ এই রিপোর্টের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হন। আওয়ামি লিগের সভানেত্রী এবং পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেত্রী শেখ হাসিনা কমিশনের রিপোর্ট প্রশংসা করে বলেন, চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কে সরকারি নীতি অপরিবর্তিত রয়েছে এবং বর্তমান সরকার জেনারেল এরশাদের আমলের নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। এই ধরনের 'গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা' নিয়ে পার্লামেন্টে আলোচনার সুযোগ না থাকায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পাঁচ বাম দলও কমিশনের রিপোর্টের সঙ্গে ঐকমত্য হন। তাঁরা সবাই পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের কথাও বলেন। তাছাড়া অন্যান্য

অংশের মানুষও এই রিপোর্টকে অভিনন্দিত করেন। যাদের কাছ থেকে কমিশন তথ্য সংগ্রহ করেন, তাঁদের সকলের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এই সন্দেহে বাংলাদেশের গুপ্তচর বিভাগ এবং সামরিক বিভাগ বহু লোককে পীড়ন করে অথবা কারাগারে আবদ্ধ রাখে। বাংলাদেশ সরকার চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে যেভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছেন, তা যাতে বাইরে প্রকাশিত না হয়, সেজন্য কমিশনের কাজে নানারকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়। তবুও কমিশন যেভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন, তা থেকে এখানকার অধিবাসীদের প্রকৃত অবস্থা জানা যায়। এই রিপোর্টের সূত্র ধরেই বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ও অন্যান্য উপজাতি জনগোষ্ঠীর অবস্থা এখানে আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পার্বত্য চট্টগ্রাম। ৫,০৯৩ মাইল ব্যাপী বিস্তীর্ণ এই অঞ্চল, বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলের ১০ শতাংশ। দশ হাজার ফুট উঁচুতে এখানকার চাষের জমি সীমিত এবং সমতলভূমির মতো তা উর্বর নয়। এখানে ১২টি পার্বত্য উপজাতির প্রায় ৬ লক্ষ মানুষ বাস করেন। সবদিক থেকেই উপজাতি জনগোষ্ঠী সমতলভূমির বাঙালী মুসলিম সংখ্যাগুরু জনসমষ্টি থেকে পৃথক। এই উপজাতিদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেন চাকমা ও মারমা উপজাতি। আর তাঁরা হলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। ত্রিপুরী উপজাতির মানুষ হলেন হিন্দু। অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ পার্বত্য অধিবাসীরা বত্তম, পাংখুয়া ও মুরু নামে পরিচিত। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ খ্রিস্টধর্মাবলম্বী অথবা উপজাতিদের চিরাচরিত ধর্মে বিশ্বাসী। এখানে দুরকমের চাষের পদ্ধতি প্রচলিত। তাঁদের মধ্যে অনেকেই উর্বর উপত্যকায় লাঙল দিয়ে জমি চাষ করেন। আর পাহাড়ের ঢালু অঞ্চলে যে পদ্ধতিতে চাষ করা হয়, তাকে 'ঝুম চাষ' বলে।

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের মুসলিম শাসকরা এই পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতিদের অধিকারে কোনও হস্তক্ষেপ করেননি। এমনকি ঔপনিবেশিক আমলেও তাঁরা ততটা বিপন্ন বোধ করেননি। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসকরা চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলকে তাঁদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে একটি 'রেগুলেশন' পাশ করে এই অঞ্চলকে সমতলভূমি থেকে পৃথক রাখা হয়। বাইরে থেকে অবাধে যাতে ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষ এখানে প্রবেশ করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রশাসনকেও পৃথক করা হয়। উপজাতিদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই ব্রিটিশ কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করা হয়। ১৯৪৭

খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর তার দশ বছর পরে এখানকার অধিবাসীদের জীবনে যে দুর্যোগ নেমে আসে, তা থেকে আজও তাঁরা মুক্ত হতে পারেননি।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পাকিস্তান সরকার কাপ্তাইতে মস্ত বড় একটি হাইড্রোইলেকট্রিক বাঁধ নির্মাণ করেন। তারফলে ৫৫,০০০ একর চাষের জমি জলমগ্ন হয় এবং উপজাতি কৃষকরা ৪০ শতাংশ জমি থেকে বঞ্চিত হন। তাতে এক লক্ষ পার্বত্য অধিবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং অল্পসংখ্যক মানুষ ক্ষতিপূরণ পান। এই অবস্থায় সহস্র সহস্র মানুষ ভারতে পালিয়ে যান। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পলাতক ৪০,০০০ উপজাতির মানুষকে ভারত সরকার অরুণাচল প্রদেশে পাঠিয়ে দেন। তারপর আশ্রয়প্রার্থী উপজাতিদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। তাঁদের সংখ্যা একলক্ষে পৌঁছয়। ৬০,০০০ চাকমা ত্রিপুরায় আশ্রয় নেন। এই রাষ্ট্রবিহীন অবস্থায় উপজাতিদের পরিবারে অনেক নবজাতকের আবির্ভাবও ঘটে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাফল্যের পরে পার্বত্য অধিবাসীরা তাঁদের অবস্থানের রাজনৈতিক স্বীকৃতি সম্বন্ধে এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কোনও এক প্রকার স্বায়ত্তশাসন লাভের বিষয়ে আশান্বিত হন। কিন্তু তাঁরা অচিরেই নিরাশ হন। তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে এই উপজাতি জনগোষ্ঠী 'চিটাগং হিল ট্রাকট্স পিপলস ইউনাইটেড পার্টি'' (সংক্ষেপে জে. এস. এস. বলা হয়) স্থাপন করেন। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ফলপ্রসূ না হওয়ায় তাঁরা সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ ধরে চলেন। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে এই সংগঠনের সেনাদল 'শান্তি বাহিনী' বাধ্য হয়ে গেরিলা কায়দায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও সমতলভূমি থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতিকারী বাঙালী মুসলমানদের ওপরে আক্রমণ শুরু করে। উল্লেখ্য এই, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার তাঁদের 'দেশান্তরে নিয়ে গিয়ে বাস করার নীতি' অনুযায়ী চার লক্ষ বাঙালী মুসলমানকে পার্বত্য চট্টগ্রামে এনে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে জমির অভাব দেখা দেয়। বাঙালী মুসলমানদের আগমনের ফলে এখানকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও জমির ওপরে অস্বাভাবিক চাপ পড়ে।

এই অঞ্চলের 'সামরিকীকরণের' সূচনা আগে থেকেই হয়। ভিন্ন ধর্ম ও জনগোষ্ঠীর মানুষের বসতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে 'সামরিকীকরণ' আরও ব্যাপ্ত ও সুদৃঢ় হয়। বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয় সামরিক শিবির। শান্তি বাহিনীর

আক্রমণ প্রতিহত করার নামে উপজাতিদের ওপরে অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়। কুড়ি বছরের বেশি সময় ধরে উপজাতিদের ওপরে অত্যাচারের খবর বাইরের দুনিয়ায় প্রচারিত হয়। নির্যাতিত উপজাতির মানুষ আত্মরক্ষার্থে ভারতে প্রবেশ করেন। আন্তর্জাতিক সেমিনারে এই বিষয় আলোচিত হয়। এখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। উপজাতিদের প্রতিরোধ ক্রমশ তীব্র হওয়ায় এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক জনমত রাজনৈতিক সমাধানের দাবি উত্থাপন করায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যার ফলে বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে একটি নতুন 'ডিস্ট্রিকট কাউন্সিল অ্যাক্ট' পাশ করে এই সংকট থেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করেন। এই আইন অনুযায়ী চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলকে তিনটি জেলায় ভাগ করা হয়; যথা বন্দরবন জেলা, রাঙ্গামাটি জেলা ও খাগড়াচারি জেলা।

কিন্তু বহুসংখ্যক পার্বত্য জনসাধারণ এই বিভাজনের বিরোধিতা করেন এবং তাঁরা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলগুলিকে অগ্রাহ্য করেন। অবশ্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই দাবি করা হয় যে, এই আইনের মাধ্যমে উপজাতি জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত 'ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলগুলি' পার্বত্য চট্টগ্রামে 'স্বায়ত্তশাসন' প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কাউন্সিলকে খুবই সামান্য ক্ষমতা দেওয়া হয়। জমিতে উপজাতিদের অধিকার স্থাপন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার কোনও ক্ষমতা এই কাউন্সিলের হাতে না থাকায় উপজাতি জনগোষ্ঠীর কোনও সমস্যার সমাধান হয়নি। উল্লেখ্য এই, 'ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল অ্যাক্টের' কোনও সাংবিধানিক ভিত্তি ছিল না। পার্বত্য জনসাধারণের অথবা তাঁদের প্রতিনিধিদের সম্মতি ছাড়াই এই অ্যাক্ট পরিবর্তন অথবা বাতিল করা সম্ভব। এই অ্যাক্ট অনুযায়ী বাঙালী বসতি-স্থাপনকারীদের উপস্থিতিকে আইনসঙ্গত করা হয়। সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলের মাত্র ১০% এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলগুলির পরিচালনাধীন ছিল। কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলগুলির নির্বাচন অবাধ ও ন্যায়পর হয়নি।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীই ছিল শাসন-ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। যদিও ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী মুসলমানদের বসতি-স্থাপন সরকারিভাবে বন্ধ করা হয়, তাসত্ত্বেও এখানে বাঙালী মুসলমানদের অবৈধ অনুপ্রবেশ চলতে থাকে। এমনকি উপজাতিদের জমি বাঙালী মুসলিম বসতিকারীদের মধ্যে বণ্টন করার খবরও প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের বিদেশ-বিষয়ক মন্ত্রীর বিবৃতি থেকে জানা যায়, চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের

জমিতে উপজাতি, বাঙালী মুসলিম ও সরকারি অফিসারদের অধিকার নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক জমি জরিপের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কিন্তু 'চিটাগং হিল ট্রাকট্স কমিশন' মনে করেন, উপজাতিদের বহু জমি অবৈধভাবে হস্তান্তরিত হওয়ায় এবং সরকারি অফিসারদের মাধ্যমে বহু বাঙালী মুসলিম বসবাসকারীরা জাল জমির দলিল লাভ করায় সরকার কর্তৃক এই জমি জরিপের ব্যবস্থা থেকে উপজাতির মানুষ মোটেই লাভবান হবেন না। কমিশন আরও মনে করেন, 'স্বাধীন নিরপেক্ষ' সংস্থার মাধ্যমে জমি জরিপ করার ব্যবস্থা করলে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা লাভবান হবেন। উল্লেখ্য এই, খাগড়াচারি জেলার ২৫% জমি অবৈধভাবে উপজাতিদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এইসব জমিতে উপজাতিদের অধিকার সম্বন্ধে কোনও তথ্য যাতে না পাওয়া যায়, সেজন্য খাগড়াচারি জেলার জমির দলিল যে-অফিসে থাকত, তা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তাসত্ত্বেও অবৈধভাবে উপজাতিদের জমিচ্যুত করার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল পরিচালনার জন্য জেনারেল এরশাদ একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কাউন্সিল কমিটি গঠন করেন। তাঁর পতনের পরে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আমলেও এই কাউন্সিল কমিটি বজায় থাকে। প্রধানমন্ত্রী হলেন কাউন্সিল কমিটির সভানেত্রী। এই কমিটির আঠারো জন সদস্যের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান, প্রতিরক্ষা, বিদেশ ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারিরা এবং সাতজন মন্ত্রী। এই কমিটির নির্দেশেই সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্তৃত্ব করে। এখানে ২৩০টি সেনাশিবির, ১০০টি বি. ডি. আর. ছাউনি এবং ৬০টি পুলিশশিবির রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে আনছার ও ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি। সিকিউরিটি ফোর্সের সংখ্যা হবে ৩৫,০০০ অর্থাৎ প্রতি কুড়িজন পার্বত্য অধিবাসীর জন্য একজন করে সিকিউরিটি ফোর্সের সদস্য (৪ থেকে ৫ পার্বত্য-পরিবারের জন্য একজন সিকিউরিটি ফোর্সের সদস্য)।

তিনটি পার্বত্য-জেলাতেই সেনাবাহিনী জমি দখল করে নতুন সেনাশিবির স্থাপন করেছে। বন্দরবন জেলায় ৭০০০ একর জমি, রাঙ্গামাটি জেলায় ৪০০ একর জমি ও খাগড়াচারি জেলায় ৫৫০ একর জমি সেনাবাহিনী দখল করে। কাপ্তাইর নৌবন্দর প্রসারের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। সেনাবাহিনী জোর করে উপজাতিদের তাঁদের বাসস্থান থেকে উৎখাত করে সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্দিষ্ট গ্রামগুলিতে এনে বসতির ব্যবস্থা করেছে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা

এই অঞ্চলকে সামরিক প্রভাব থেকে মুক্ত করতে এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করতে বারে বারে বাংলাদেশ সরকারের কাছে দাবি পেশ করেন। জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে, এই অভিযোগও কমিশনের কাছে করা হয় এবং কমিশনের রিপোর্টে তার দৃষ্টান্তও দেওয়া হয়। বহু ক্ষেত্রেই বাঙালী মুসলিম বসবাসকারীরা সেনাবাহিনীর সহযোগে উপজাতিদের আক্রমণ করেন, তাও কমিশনের রিপোর্টে উল্লিখিত হয়।

জেনারেল এরশাদের পতনের পরে নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাজনৈতিক দলগুলি আরও খোলামেলা তাদের মত ব্যক্ত করতে থাকে। স্বভাবতই পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়েও সভা বা সেমিনার করা সম্ভব হয়, যদিও এইসব সভার উদ্যোক্তারা সরকারি আক্রমণের শিকারও হন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাই 'গ্রেটার চিটাগং হিল ট্রাকটস স্টুডেন্টস কাউন্সিল' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম জনসভার আয়োজন করেন। বাঙালী ছাত্র সংগঠনের নেতারা পার্বত্য ছাত্রদের দাবির সমর্থনে বক্তৃতা দেন। কিন্তু সম্মেলনের পরে বাংলাদেশ সরকারের গুপ্তচর বিভাগ (এন. এস. আই.) ছাত্রদের পেছনে লাগায় কয়েকজন পার্বত্য ছাত্রনেতা আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত 'চিটাগং হিল ট্রাকটস পিপলস কাউন্সিল' সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করায় ছাত্র সম্মেলনের কয়েকদিন আগে তাঁদের কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং শান্তিবাহিনীর সদস্য বলে তাঁদের অভিযুক্ত করা হয়। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে সভা-সমিতি করাও বিপজ্জনক হয়। বিভিন্ন অভিযোগে পার্বত্য ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হয়। উপজাতিদের স্বায়ত্ত-শাসনের আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় কয়েকটি সংস্থাও গঠন করা হয়।

এই প্রতিকূল অবস্থাতেও 'বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস্ কমিশন' ও কয়েকটি রাজনৈতিক দল পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করে এবং পার্বত্য জনসাধারণের সংগঠনগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করে। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ আগস্ট 'বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস কমিশন' নিউইয়র্কে স্থাপিত 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ল ইন ডেভেলপমেন্ট' নামক সংস্থার সহযোগিতায় ঢাকায় চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল সম্বন্ধে এক সেমিনারের ব্যবস্থা করে। তাতে সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি কে. এম. সোভান এবং বক্তাদের মধ্যে পার্লামেন্টের সদস্য, বিশিষ্ট বাঙালী

বুদ্ধিজীবী ও পার্বত্য অঞ্চলের প্রতিনিধিরা ছিলেন। তাঁরা সবাই পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বেগম খালেদা জিয়ার সরকার জেনারেল এরশাদ প্রবর্তিত নীতি অনুসরণ করায় প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনাও করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে দ্বৈত শাসনের (একই সঙ্গে অসামরিক ও সামরিক ব্যবস্থার) অবসান দাবি করা হয়। একটি 'স্বাধীন' ও 'নিরপেক্ষ' কমিটি গঠন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জমিতে বাঙালী বসবাসকারীদের কতটা আইনসঙ্গত অধিকার আছে, তা পরীক্ষা করতে বলা হয়।

এই সেমিনারে বক্তারা এই কথাও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শুধু মানবাধিকারের সমস্যা নয়, এটি একটি রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সমস্যাও বটে। এই সভা থেকে এই দাবিও উত্থাপিত হয়, অনতিবিলম্বে একটি 'পার্লামেন্টারি কমিটি' ও 'জাতীয় নাগরিক কমিটি' গঠন করে 'জাতির বৃহত্তর স্বার্থে'' পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করা উচিত। এই সভা নাগরিক কমিটির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সরকারকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে স্পষ্ট করেই বলা হয়, জাতীয় সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান একান্ত প্রয়োজন।

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামি লিগ যে ইস্তাহার রচনা করে, তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলা হয়। নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আসনেই আওয়ামি লিগের প্রার্থীরা জয়ী হন। বাংলাদেশ পার্লামেন্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা হলেও বি এন পি পরিচালিত সরকার পার্লামেন্টে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করেননি। কেন জেনারেল এরশাদের নীতি বর্তমান সরকার অনুসরণ করেন, তা নিয়ে কোনও আলোচনাও পার্লামেন্টের সদস্যরা করতে পারেননি। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্বন্ধে পার্লামেন্ট কোনও দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। এমন কি ওখানকার প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য কোনও পার্লামেন্টারি কমিশনও গঠিত হয়নি। সেনাবাহিনী ও সরকার পার্লামেন্টকে অগ্রাহ্য করেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সুতরাং এরশাদ সরকারের সময়ে এখানে যে-অবস্থা ছিল, তাই বজায় রয়েছে। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে কোনও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং সরকারি নীতিরও কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বহু সংবাদই প্রকাশিত হচ্ছে। বাঙালী মুসলমানদের অনুপ্রবেশও আগের মতোই হচ্ছে। 'চিটাগং হিল ট্রাক্‌ট্‌স কমিশন'

যেসব প্রস্তাব দেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : অবিলম্বে বাঙালী মুসলমানদের বসতি-স্থাপন বন্ধ করতে হবে। যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করে জমিতে আইনসঙ্গত অধিকারের বিষয়টি পরীক্ষা করতে হবে। যাঁরা এখানে বসতি স্থাপন করেন, তাঁদের সমতলভূমিতে ফেরত পাঠানো সম্ভব কিনা, তা দেখতে হবে। যেসব গ্রামে উপজাতিদের আবদ্ধ করা হয়, সেই গ্রামগুলিকে ভেঙে দিতে হবে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের 'চিটাগং হিল ট্রাকট্স রেগুলেশন' সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা চলবে না। এখানে 'স্বায়ত্তশাসিত সরকার' গঠন করতে হবে। এই সরকারই জমিতে অধিকার ও বসতি-স্থাপন বিষয়ে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের রেগুলেশন প্রয়োগ ও সংশোধন করবার অধিকারী হবেন। তার জন্য অনতিবিলম্বে প্রয়োজন হলো চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল থেকে সামরিক বাহিনী তুলে নিয়ে শান্তির পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা। তাহলেই সমগ্র অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। আওয়ামি লিগ ও অন্যান্য বামপন্থী রাজনৈতিক দল এই পথেই সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্যোগী হওয়ায় আশার আলো দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার কতটা সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন, তার ওপরেই উপজাতি জনগোষ্ঠীর সমস্যার সমাধান নির্ভর করছে।*

সূত্র-নির্দেশ

*এই প্রবন্ধের সমস্ত তথ্যই নেওয়া হয়েছে নিম্নোক্ত রিপোর্ট থেকে : **'Life is not Ours'** Land and Human Rights in the Chittagong Hill Tracts Bangladesh An update of the May, 1991 Report. The Chittagong Hill Tracts Commission, March, 1992, Copenhagen, Denmark.

অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা

'প্রসঙ্গ : অনুপ্রবেশ' গ্রন্থ মুদ্রণের কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ঠিক তখনই শ্রীমানব মুখার্জী লিখিত 'বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ রাজনীতি এবং বাস্তবতা' গ্রন্থখানি পড়বার সুযোগ হলো। তাতে দেখতে পেলাম, তিনি কয়েকটি জায়গায় আমার দুটি প্রবন্ধের কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থের সূচনাতেই বলেছেন, গ্রন্থ রচনা-কালে আমার প্রবন্ধ তাঁর মনে 'ঔচিত্যবোধ' জাগ্রত করেছে। আর ভারতের প্রাক্তন বিদেশ-সচিব শ্রীমুচকুন্দ দুবে 'পিপলস ডেমোক্র্যাসি' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের মাধ্যমে 'নিজের অজ্ঞাতে' মানব মুখার্জীকে উক্ত গ্রন্থ লিখতে 'সাহস যুগিয়েছেন'।

আমার বক্তব্য-বিষয় আমার লিখিত উক্ত গ্রন্থের দুটি প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। তার পুনরুক্তি না করে মানব মুখার্জী যেভাবে আমার বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, তা তাঁর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছেন, "অধ্যাপক অমলেন্দু দে শারদীয়া সমন্বয়ে যে বিস্তৃত প্রবন্ধটি এবিষয়ে লিখেছেন—তাতে নিজস্ব কোনও মন্তব্য এবিষয়ে করেননি। কিন্তু তিনি লিখেছেন 'বাংলাদেশের সেন্সাস রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনা করে এবং পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ নতুন রেশন কার্ড বিলি করা হয়েছে' তা থেকে কেউ কেউ বলেন, গত দশকে ১০ মিলিয়ন অথবা ১০ থেকে ১৪ মিলিয়ন বাংলাদেশী ভারতে বসতি স্থাপন করেছে'। অবশ্য এই 'কেউ কেউ'রা কে—তা অবশ্য তিনি ভেঙে বলেননি।"[১] এবার আমি কি লিখেছি, তা দেখা যাক।

শ্রীমুখার্জী আমার পুস্তিকা 'বাংলাদেশের জনবিন্যাস ও সংখ্যালঘু সমস্যা' পড়েছেন। অথচ এই পুস্তিকায় যে, সুনির্দিষ্ট করে যাঁরা অনুপ্রবেশ-কারীদের সংখ্যা উল্লেখ করেন, তাঁদের নাম দিয়েছি, তা তাঁর দৃষ্টি কি করে এড়িয়ে গেল, তা বুঝতে পারছি না।[২] তাছাড়া 'সমন্বয়' পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লেখা থেকে তিনি যে অংশটুকু উদ্ধৃত করেন, তার পরের লাইনে এই কথাগুলি মুদ্রিত রয়েছে : "সঞ্জয় হাজারিকা স্পষ্ট করেই বলেন, ১০ থেকে ১৪ মিলিয়ন

বাংলাদেশী ভারতে বসতি স্থাপন করেছে।"[৩] মানব মুখাজী এই লাইনটি কেন বাদ দিলেন, তা তিনিই বলতে পারবেন।

মানব মুখাজী তাঁর গ্রন্থের একই পৃষ্ঠায় আমার প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন: "বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বা বি জে পি-র বক্তব্য তিনি উদ্ধৃত করেছেন—কিন্তু এ প্রশ্নে কোনও আলোচনা অথবা সমালোচনা তিনি করেননি।"[৪] আমি মৌলবাদীদের সম্বন্ধে কি বলেছি, তা তো আমার প্রবন্ধেই রয়েছে। কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃবৃন্দ অনুপ্রবেশকারীদের যে সংখ্যা নির্ধারণ করেন, সেবিষয়ে আমি লিখেছি: "কিন্তু কোন্ সূত্র থেকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বি জে পি এই তথ্য সংগ্রহ করেছে, তা এই দুটি দলের নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেননি।" দেখা যাচ্ছে, মানব মুখাজী আমার লেখার এই অংশটুকুও বাদ দিয়েছেন। আমি তো স্পষ্ট করেই বলেছি, "সম্প্রতি অনুপ্রবেশ সমস্যা রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করেছে।" আর এই প্রসঙ্গেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বি জে পি নেতাদের দেওয়া সংখ্যার কথা বলেছি।[৫]

মানব মুখাজী তাঁর গ্রন্থে শ্রী মুচকুন্দ দুবের **'পিপলস ডেমোক্র্যাসিতে'** ও **'মেইনস্ট্রীম'** কাগজে প্রকাশিত অধ্যাপক বি. কে. রায় বর্মনের রচনা উল্লেখ করেছেন। আমি মুচকুন্দ দুবের মতামত আলোচনায় তাঁর লিখিত অন্য রচনাও উল্লেখ করেছি। কিন্তু মানব মুখাজী মুচকুন্দ দুবের অন্য রচনা তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেননি।[৬] তা সত্ত্বেও তিনি আমার সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেন: "বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের সংখ্যার বিষয়ে যাঁরা একটু কম বলেছেন—তাঁদের অধ্যাপক দে যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। যেমন মুচকুন্দ দুবে বা বি. কে. রায় বর্মন"।[৭] মুচকুন্দ দুবে অনুপ্রবেশকারীদের যে সংখ্যা উল্লেখ করেছেন, সেপ্রসঙ্গে মানব মুখাজী নিজেই তো এই মন্তব্য করেছেন: "শ্রী মুচকুন্দ দুবের অনুমিত সংখ্যা '৪-৫ লাখ' এটা বাস্তবতার দিক থেকে নিঃসন্দেহে কম।"[৮] তাহলে দেখা যাচ্ছে, কেবলমাত্র আমি নই, মানব মুখাজীও শ্রী দুবের প্রদত্ত সংখ্যার সঙ্গে একমত হতে পারেননি।

আমি মুচকুন্দ দুবে ও বি. কে. রায় বর্মনের প্রবন্ধ সম্বন্ধে কি বলেছি, তা এখানে উদ্ধৃত করছি: "উত্তর-পূর্ব ভারতের অনুপ্রবেশ সমস্যা বিশ্লেষণে বাংলাদেশের জনসাধারণের দুরবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জনবিন্যাস-মানচিত্রের আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। অধ্যাপক রায় বর্মন ও মুচকুন্দ দুবে এই বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেননি।"[৯] তারপর আমি এই সব বিষয়ে

তথ্যের সাহায্যে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। 'সমন্বয়' পত্রিকায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধে আমি লিখেছি, মুচকুন্দ দুবে তাঁর প্রবন্ধে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যেসব তথ্য দিয়েছেন, তা যথার্থ নয়। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সর্বগ্রহণ-যোগ্য হওয়াতে সুফল পাওয়া গেছে। বি. কে. রায় বর্মনও বাংলাদেশের জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্য মনে করেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাভাবিক জন্ম ও মৃত্যুর হার যা উল্লেখ করেন, তাও বাংলাদেশ সেন্সাস অনুযায়ী ঠিক নয়, তা আমি আলোচনা করেছি এমন কি এই কথাও বলেছি, তাঁর উল্লিখিত জনবসতির ঘনত্বও যথার্থ নয়।[১০] আর কি পরিস্থিতিতে ধর্মীয় সংখ্যাগুরু ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষেরা বাংলাদেশ থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে, তার কোনও বিস্তৃত বিশ্লেষণ রায় বর্মন ও দুবের রচনাতে পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে আমার প্রবন্ধে আলোচনা করেছি।[১১] তাঁদের প্রবন্ধের বিষয় নিয়ে আমার আলোচনায় মানব মুখার্জী কেন ক্ষুণ্ণ হলেন, তা আমার বোধগম্য নয়।

উল্লেখ্য এই, আমি তো মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসুর প্রদত্ত তথ্য অবলম্বন করে রায় বর্মন ও দুবের মতামত বিশ্লেষণ করেছি। উঁরা দুজনেই বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করে কেবলমাত্র সেন্সাস রিপোর্ট ও বৈধ পাসপোর্ট নিয়ে এসে যারা ফিরে যায়নি, সেই সব সংখ্যার সাহায্যে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে রায় বর্মন যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে তাঁর মতামত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা থেকে বিরত থেকেছেন।[১২]

বিস্মিত হয়েছি এই দেখে যে, মানব মুখার্জী তাঁর গ্রন্থের কোথাও মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রবন্ধের উল্লেখ করেননি। জ্যোতি বসু কতটা গুরুত্ব আরোপ করে 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের' বিষয় উল্লেখ করেন, তা তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করলেই বোঝা যায়।[১৩] মানব মুখার্জী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তথ্য থেকে প্রাপ্ত রাজ্য পুলিশের, মোবাইল টাস্ক ফোর্সের এবং বি. এস. এফের মাধ্যমে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত সময়কালে সীমান্তে আটক বাংলাদেশীদের সংখ্যা এবং তার সম্প্রদায়গত বিন্যাস (সারণি ১৮) বিশ্লেষণ করে যে মতামত ব্যক্ত করেন তা এখানে উল্লেখ করছি।[১৪] মানব মুখার্জী লেখেন, এই সময়ে (১৯৭৭ জুন, ১৯৯৩) "ভিসা নিয়ে যেসব অনুপ্রবেশকারী এসেছিল, তাদের ৭১.৩% ই হলো হিন্দু, মুসলমান মাত্র ২৮%। কিন্তু কোনও বৈধ নথিপত্র ছাড়া সীমান্ত পার হতে গিয়ে যারা ধরা পড়েছে, তাদের মধ্যে হিন্দু ২৬.৯%

এবং মুসলমান ৭২.৩%। অর্থাৎ চিত্রটি সম্পূর্ণ বিপরীত।"[১৫] তাঁর মতে, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই পাসপোর্ট ভিসা নিয়ে আসে। গরিব মানুষদের পক্ষে তা সংগ্রহ করা কঠিন কাজ। তারা দালালদের সাহায্যে সীমান্ত অতিক্রম করা সহজ মনে করে।

সুতরাং মানব মুখার্জী সিদ্ধান্ত করেন: "এর থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশী হিন্দুদের মধ্যে দেশ ছাড়ার প্রবণতা গরিব অংশের তুলনায় অবস্থাপন্ন অংশের মধ্যে বেশি।"[১৬] প্রশ্ন হলো: বাংলাদেশের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে এবং অন্যান্য সূত্র থেকে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনবিন্যাসের যে চিত্র পাওয়া যায়, তা থেকে কি নির্দিষ্টভাবে মানব মুখার্জীর 'গরিব' আর 'অবস্থাপন্ন' হিন্দু এই বিভাজন মেনে নেওয়া যায়? তাঁকে এই বিষয়ে আরও ভাবতে অনুরোধ করছি।

তা ছাড়া মানব মুখার্জী যে সূত্র থেকে সারণি-১৮ উদ্ধৃত করেছেন, সেই একই সূত্র থেকে এই তথ্যটি দেননি যে, কত শতাংশ 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী' সীমান্তে ধরা পড়ে? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সূত্র থেকেই তো জানা যায়, কুড়ি শতাংশের বেশি অনুপ্রবেশকারী কখনই ধরা পড়ে না। তাহলে ভাবতে হয়, কুড়ি শতাংশ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ওপরে নির্ভর করে কি কোনও সিদ্ধান্ত করা উচিত হবে? জ্যোতি বসু স্বীকার করেন, বি. এস. এফ-এর 'জাল কেটে' ভারতে অনেক মানুষ ঢুকে পড়ায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব হচ্ছে না।[১৭]

অবশ্য মানব মুখার্জী স্বীকার করেন, "সংবিধানগতভাবে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের খুব স্বস্তিতে থাকার কথা নয়। এর পরও বাংলাদেশের রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ অনেক তীব্র চেহারা নিয়েছে। এতে হিন্দুদের দেশ ছাড়ার পেছনে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কিছু প্রভাব আছে। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে সংখ্যালঘুদের অবস্থার দিকে খোলা চোখে তাকালেই আন্দাজ করা সম্ভব বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের কি অবস্থা। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের চলে আসাটা একান্তই রাজনৈতিক কারণে হচ্ছে—এই রকম কোনও সিদ্ধান্তেও পৌঁছানো যাবে না।...কাজেই অনুপ্রবেশের কারণ কেবল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্যে খুঁজলে চলবে না। অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ প্রভাব ফেলতে পারে একমাত্র অর্থনৈতিক কোনও কারণ। এই দিকেই আমাদের দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করা উচিত।"[১৮]

উপরের উদ্ধৃত অংশের প্রথমে মানব মুখার্জী বাংলাদেশের 'ধর্মীয় রাষ্ট্রে'

সংখ্যালঘুদের অবস্থা, 'রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ' এবং ভারত-বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের বিষয়ে যা বলেছেন, তার সঙ্গে তো আমার বক্তব্যের কোনও মৌল বিরোধ নেই। বরঞ্চ তাঁর সঙ্গে মুচকুন্দ দুবের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মানব মুখার্জী অনুপ্রবেশের কারণ কেবলমাত্র 'সাম্প্রদায়িক রাজনীতির' মধ্যে না খুঁজে 'অর্থনৈতিক' কারণের প্রতি 'দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত' করতে বলেন। মুচকুন্দ দুবে 'সাম্প্রদায়িক রাজনীতির' প্রতি কোনও গুরুত্বই আরোপ করেননি। তিনি মনে করেন, প্রধানত 'অর্থনৈতিক কারণেই' বাংলাদেশীরা ভারতে প্রবেশ করছে। আর তিনি অনুপ্রবেশ সমস্যাকে 'স্বাভাবিক বিশ্ব-সমস্যা' মনে করে ভারতের ক্ষেত্রে এই সমস্যার গুরুত্বকে অবহেলা করেন। উল্লেখ্য এই, বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রে 'অর্থনৈতিক কারণ' গুরুত্বপূর্ণ হলেও, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কিভাবে বৈষম্যের শিকার হওয়ায় বিপর্যস্ত হয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে, তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না করলে সেখানকার সমাজচিত্রের ছবিটি স্পষ্ট হয় না।

এই কারণেই বাংলাদেশের নাগরিকদের দেশত্যাগের কারণ আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য যে 'শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার' সৃষ্টি করে, সে বিষয়ে বাংলাদেশে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ এখানে পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত করা হলো। উল্লেখ্য এই, সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার 'শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি' নিলামে বিক্রির সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতা ও হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছে। এই সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বাংলাদেশের এগারোজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বিবৃতি দেন।[১৯]

মানব মুখার্জী খেয়াল করেননি, আমি কয়েকটি বিষয়ে মুচকুন্দ দুবের বক্তব্যের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করলেও, তিনি যেভাবে ভারতের ধর্মান্ধ হিন্দু মৌলবাদীদের সমালোচনা করেছেন, তার সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করে যে কথা আমি বলেছি, তা হলো : "কিন্তু পরিস্থিতির সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে হলে বাংলাদেশের ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের ভূমিকাটির প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। তা না হলে উভয় রাষ্ট্রের ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের বিচ্ছিন্ন করে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনকে শক্তিশালী করা সম্ভব হবে না।"[২০] আর একটি প্রশ্নও আমি উত্থাপন করে আলোচনা করেছি। তা হলো, বাংলাদেশ যেভাবে দ্রুত গতিতে তার বহুধর্মীয় রাষ্ট্রিক চরিত্র হারিয়ে

ফেলছে, তাতে কি মৌলবাদীদের হাত শক্ত হবে না? মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে তো এই বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার।

মানব মুখার্জী অভিযোগ করেছেন, আমি কেন অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা সম্বন্ধে 'নিজস্ব কোনও মন্তব্য' প্রকাশ করিনি। তিনি ভাল করে আমার প্রবন্ধ পড়লে সহজেই দেখতে পেতেন, আমি বিভিন্ন দল ও ব্যক্তির মতামত উল্লেখ করে নানা দিক থেকে অনুপ্রবেশ সমস্যার গভীরতা উপলব্ধি করার প্রয়াস করেছি। যখন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে সরকারিভাবে কোনও নির্ভরযোগ্য সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আমার পক্ষে তা নির্দিষ্ট করে বলা কি করে সম্ভব। এই অনুপ্রবেশ যে ঘটছে, তা অবশ্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার স্বীকার করেন। আর রাজ্য সরকারের মতামত আলোচনায় আমি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রবন্ধের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি। একই সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশের তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করেছি।[২১]

এই সব লক্ষ্য না করার ফলেই মানব মুখার্জী কোনও সংকোচ বোধ না করে বলতে পারেন: "এর থেকে মনে হয়, অধ্যাপক দে মুচকুন্দ দুবে বা বি. কে. রায় বর্মনের থেকে এই প্রশ্নে ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী বা তপন সিকদারদের অনেক কাছাকাছি অবস্থান করছেন।"[২২] তিনি যদি মুচকুন্দ দুবে ও বি. কে. রায় বর্মনের বক্তব্যের ওপরে বেশি নির্ভর করেন, আর জ্যোতি বসুর মতামত অগ্রাহ্য করেন, তাতে স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে, তিনি অনুপ্রবেশ সমস্যাটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করে অতি সরলীকরণ পদ্ধতিতে আমাকে ধর্মীয় মৌলবাদীদের শিবিরে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই কারণেই 'এর থেকে মনে হয়' জাতীয় শব্দ চয়ন করে তিনি আমার স্থানটি বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বি. জে. পির 'কাছাকাছি' নির্দিষ্ট করেন। তাঁর মতো এক বিশিষ্ট যুবনেতা, যিনি সমাজ-রূপান্তরের দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর, তাঁর লেখায় পরিমিতি-বোধের অভাব দেখে গভীর বেদনা অনুভব করি।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিশ্লেষণ করে 'হারিয়ে যাওয়া জনসংখ্যা' সম্বন্ধে আমি যেকথা লিখেছি, তা প্রথমে আমার প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত করছি: "১৯৮১-১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের সময়কালে বাংলাদেশ আদমশুমারি অনুযায়ী দেখা যায়, বাংলাদেশে যে পরিমাণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার কথা, তা থেকে প্রায় ১ কোটি জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। স্বভাবতই এই বিষয় নিয়ে সংবাদপত্রে আলোচনার সূত্রপাত হয় এবং তাতে এই জনসংখ্যাকে 'missing population'

(হারিয়ে যাওয়া জনসংখ্যা) বলে উল্লেখ করা হয়। এই কারণেই ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে পেঁৗছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.১৭ ধরা হলেও এর মধ্যে 'হারিয়ে যাওয়া জনসংখ্যা' বাদ দেওয়ায় বাংলাদেশে প্রকৃত জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটেনি"।[২৩] এই তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি বাংলাদেশের সূত্র থেকে। তা আমার প্রবন্ধেও উল্লেখ করেছি।

মানব মুখার্জী এই তথ্যের ওপরে আস্থা স্থাপন করতে পারেননি। তাই কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েই তিনি লিখেছেন, "হারিয়ে যাওয়া ১ কোটির" তত্ত্বের "ওপর অরুণ সৌরী, সঞ্জয় হাজারিকা থেকে অমলেন্দু দে, সবাই খুবই ভরসা করেছেন। এবং এটাকে অনুপ্রবেশের অকাট্য প্রমাণ হিসাবে দেখেছেন।" তারপরই তিনিই ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ভারতের জনসংখ্যা উল্লেখ করে বলেন, " 'হারিয়ে যাওয়া' ভারতীয়দের সংখ্যা হলো ১ কোটি ৮৮ লক্ষ। এখন শ্রী সৌরী বা অধ্যাপক দে-কে বলতে হবে এই ১ কোটি ৮৮ লক্ষ ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা কোন্ দেশে প্রবেশ করেছে?"[২৪]

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের 'হারিয়ে যাওয়া জনসংখ্যা' তুলনা করে মানব মুখার্জী এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন, সেন্সাসে এই ধরনের 'হারিয়ে যাওয়া জনসংখ্যা' পাওয়া যায়। তাই বাংলাদেশের জনসংখ্যা-বিশারদ বা সাংবাদিকরা এই বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলেও মানব মুখার্জী ভিন্নমত পোষণ করেন। শ্রী মুখার্জী বাংলাদেশের '১ কোটি হারিয়ে যাওয়া জনসংখ্যার' সঙ্গে ভারতের 'হারিয়ে যাওয়া ১ কোটি ৮৮ লক্ষ জনসংখ্যার' যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, সেবিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, মোট জনসংখ্যা এবং অন্যান্য শর্তের ভিত্তিতে পরিসংখ্যানবিদরা যে গণনা করেন, তাতে ১-২% ভুল হতেই পারে, যদি আলোচ্য শর্তগুলির তারতম্য ঘটে। কিন্তু ১০% ভুল কোথাও হয় না, বা হতে পারে না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে তা হয়নি। সে কারণেই উক্ত ১ কোটি জনসংখ্যাকে পার্শ্ববর্তী দেশে অনুপ্রবেশ করেছে বলে ধরা হচ্ছে। তাছাড়া অন্য কোনও ব্যাখ্যা করা যায় না।

এবার দেখা যাক, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের বাংলাদেশ সেন্সাস রিপোর্টে এই বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায় কিনা। প্রথমেই এই সেন্সাস থেকে মুসলমান ও হিন্দু জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি উল্লেখ করা হলো :

	১৯৮১	১৯৯১
মুসলমান	৮৫.৪%	৮৮.৩%
হিন্দু	১২.১%	১০.৫%

দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের মুসলিম জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হিন্দু জনসংখ্যা আরও হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ সেন্সাস রিপোর্টগুলিতে 'হারিয়ে যাওয়া হিন্দু জনসংখ্যার' উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বিষয়ে সম্প্রতি মহিউদ্দীন আহমদ **'হলিডে'** পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লেখেন, ১৯৭৪-৮১ খ্রিস্টাব্দে হারিয়ে যাওয়া হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ১.২২ মিলিয়ন, আর ১৯৮১-৯১ খ্রিস্টাব্দে তা ছিল প্রায় ১.৭৩ মিলিয়ন। তিনি লেখেন, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিদিন ৪৭৫ জন হিন্দু বাংলাদেশ থেকে 'উধাও' (disappeared) হয়।[২৫] তিনি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন : জনবিন্যাসের ভাষায় এই ঘটনাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ? তার উত্তরে তিনি নিজেই বলেন, 'বহির্গমন' (migration)- এই শব্দ ব্যবহার করেই 'হারিয়ে যাওয়া' জনসংখ্যাকে উল্লেখ করা সম্ভব।

মহিউদ্দীন আহমদ এই কথাও বলেন, বাংলাদেশের 'জাতিগত (ethnic) সংখ্যালঘুদের বিষয়ে প্রকৃত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। **বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস (বি. বি. এস.)** সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে ১.২ মিলিয়নের কিছু বেশি 'জাতিগত সংখ্যালঘু' জনসমষ্টি রয়েছে। তাদের মধ্যে চাকমাদের সংখ্যা হলো ২৫২,৯৮৬। অর্থাৎ তারাই হলো জনসংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। বি. বি. এস. সূত্রে জানা যায়, চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল থেকে ৩৩,০০০ চাকমা 'উধাও' (disappeared) হয়েছে। সমগ্র উপজাতি জনসংখ্যার মধ্যে চাকমাদের 'উধাও' হওয়ার সংখ্যা যথাক্রমে ছিল ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ২৪% ও ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ২১%। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টের সমস্ত তথ্য পাওয়া গেলে অন্যান্য 'উপজাতিগোষ্ঠীর' অবস্থা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে। মহিউদ্দীন আহমদ-এর প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ বলেই এখানে **পরিশিষ্ট** অংশে মুদ্রিত করা হলো।[২৬]

উল্লেখ্য এই, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারির চূড়ান্ত ফল ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় এই সেন্সাস রিপোর্ট সম্বন্ধে এখনও বিস্তৃত আলোচনা না হলেও কিছু কিছু মন্তব্য পাওয়া যায়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'যায় যায় দিন' পত্রিকায় ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারির ফল সম্পর্কে লেখা হয়েছে : "এই ফল কোনও রাজনৈতিক বা সামাজিক বিতর্ক আলোচনার সূত্রপাত করেনি ! অথচ এই ফলই হুঁশিয়ারি দিচ্ছে, আমরা জাতি হিসেবে কি বিপজ্জনক গতিতে একটি মারাত্মক বিস্ফোরক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।...তথ্যটি এই দাঁড়িয়েছে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি-রোধে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যায়নি। প্রতি মিনিটে এখন চারজনের জন্ম হচ্ছে।

শহরে জনসংখ্যা বাড়ছে। আগামীতে দেশে একটি সার্বিক নৈরাজ্য এড়াতে হলে জন্মনিয়ন্ত্রণ অভিযানের পাশাপাশি সবার জন্য শিক্ষা প্রসারে অবিলম্বে তৎপর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা" আদমশুমারির সংখ্যাতত্ত্ব থেকে বোঝা যাবে।[২৭]

বাংলাদেশের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্বন্ধে মানব মুখার্জী মন্তব্য করেন : "আরও একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে—বাংলাদেশের ২ কোটি ২০ লক্ষ সক্ষম দম্পতির মধ্যে ৯৫ লক্ষ, কোনও না কোনও জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি গ্রহণ করে। অর্থাৎ জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি গ্রহণ করে মোট সক্ষম দম্পতির সংখ্যা ৪৩%। তৃতীয় বিশ্বের যে কোনও দেশের তুলনায় এটি যথেষ্ট ভাল হার।"[২৮] মানব মুখার্জী বাংলাদেশের যে সূত্র থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তা তিনি ঠিকভাবে উল্লেখ করতে পারেননি। সঠিক তথ্য হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশে সক্ষম দম্পতির সংখ্যা ২ কোটি ২০ লক্ষ। তার মধ্যে ১ কোটি ৫০ লক্ষ দম্পতি কোনও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেননি। অর্থাৎ ৭০ লক্ষ দম্পতি কোনও না কোনও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তার হার হলো ৩০.৩%। কিন্তু যে-সকল মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন, তাঁদেরও সন্তান জন্মদানের হার হলো ৪.৩ জন, অর্থাৎ কমপক্ষে তাঁরা প্রত্যেকে গড়ে চার সন্তানের জন্ম দেন। আর যাঁরা জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন না, তাঁদের সন্তান জন্মদানের হার আরও বেশি। সেজন্যই তৃতীয় বিশ্বের যে কোনও দেশের তুলনায় এটি যথেষ্ট ভালো হার তো নয়ই, বরং বেশ খারাপ।[২৯]

উল্লেখ্য এই, বাংলাদেশে ১৮ বছর বয়সের মহিলাদের প্রতি ৫ জনের ৪ জনই মা হয়ে যান। শতকরা ৬৬ ভাগ মহিলা মা হন ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগে, আর শতকরা ৮০ ভাগ মা হন ২০ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগে। ইউনিসেফের হিসেব থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার হলো ১১০ জন। যারা বেঁচে থাকে, তাদের মধ্যে অপুষ্টিতে ভোগে ৭০ জন। জন্মের এক বছরের মধ্যেই মারা যায় ৪ লক্ষ, আর পাঁচ বছরের মধ্যে মারা যায় ৮ লক্ষ শিশু। প্রকট দারিদ্রের জন্য বাংলাদেশের মহিলাদের মধ্যে যেখানে ৭০ ভাগই অপুষ্টিতে ভুগছেন, সেখানে অপরিণত বয়সে তাঁদের বিয়ে এবং বিরামহীনভাবে সন্তান প্রসব করে যেতে হচ্ছে! এখানে প্রতি এক লক্ষ সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যু ঘটে ৬০০ প্রসূতির। ভারত ও পাকিস্তানে এ সংখ্যা যথাক্রমে হলো ৩৪০ ও ৫০০ জন প্রসূতি।[৩০]

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলি এইভাবে নির্দিষ্ট করা যায় : (১) মেয়েদের বিয়ের বয়সের যে আইন (সর্বনিম্ন ১৮ বছর), তা কার্যকর

করা হয় না। (২) বহু পরিবারে পুত্রসন্তানের আকাঙ্ক্ষায় সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। (৩) দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী গ্রামীণ মানুষের ধারণা হলো, বড় পরিবার মানেই বেশি আয়, অর্থাৎ 'যত সন্তান তত লাঠি'। (৪) মৌলবীদের পরিবার পরিকল্পনা-বিরোধী প্রচারের ফলে ধর্মীয় কুসংস্কার জন্মনিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে স্বামীর আপত্তির কারণে সক্ষম দম্পতির শতকরা ১০ ভাগ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারছে না। (৫) শিক্ষার অভাবে মহিলাদের পুরুষ-নির্ভরতা থাকায় সামাজিক জীবনে তাঁদের নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়।[৩১]

ওয়াশিংটনের আন্তর্জাতিক সংস্থা **পপুলেশন ক্রাইসিস কমিটির** রিপোর্ট উল্লেখ করে মানব মুখার্জী লেখেন, "৯৫টি উন্নয়নশীল দেশ-সহ মোট ১২৪টি দেশের ক্ষেত্রে তারা সমীক্ষা চালায়। জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলির ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে তারা একটি অংক করে—তারা এক্ষেত্রে ১০০-তে বিভিন্ন দেশকে নম্বর দেয়। তাদের হিসাব অনুযায়ী ৭৫-এর ওপর নম্বর পাওয়া মানে খুবই ভালো। সর্বোচ্চ নম্বর পায় ডেনমার্ক—৯৭, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পায় দক্ষিণ কোরিয়া—৯৩, এর পরেই চীন—৯০। বাংলাদেশ নম্বর পায়—৭৭, যা ভারতবর্ষ (৬৩) তো বটেই, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৭৫ থেকেও বেশি। পাকিস্তানের অবস্থান হয় একদম নিচের দিকে, তাদের নম্বর হয় মাত্র ৩৭। জন্মনিয়ন্ত্রণে এই উপমহাদেশের সফলতম দেশ শ্রীলঙ্কা পায় ৮০।"[৩২] এ-প্রসঙ্গে বিশ্ব ব্যাংকের সার্ভে রিপোর্ট এবং বাংলাদেশ সরকারের রিপোর্ট উল্লেখ করলেই দেখা যাবে, এই তথ্য নির্ভরযোগ্য নয়।

বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে বলা হয়েছে, জন্মশাসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের চেষ্টা সংগঠিত নয়। পরিবারের সামগ্রিক কল্যাণের দিকটি উপেক্ষা করে কেবলমাত্র সন্তান-সংখ্যা কম রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক ইউনিটগুলিকে লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করে তাদের চাপের মধ্যে রাখা হয়েছে। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। বাংলাদেশের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮০-১৯৮৫) বন্ধ্যাকরণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়। তার ৭০ ভাগ অর্জিত হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ দাবি করেন। কিন্তু পরে জানা যায়, এই দাবির কোনও ভিত্তি নেই। বিভাগীয় তদন্ত-দল দিনাজপুর, বরিশাল, খুলনা, পটুয়াখালির বিভিন্ন থানায় গিয়ে দেখতে পান, বন্ধ্যাকরণের তালিকায় যাদের নাম রয়েছে, তাদের অধিকাংশের ঠিকানা 'ভুয়া'। ১৯৮৯ খিস্টাব্দে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে একটি উচ্চপর্যায়ের

তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ক তথ্যের ৯২ ভাগই 'ভুয়া' বলে উল্লেখ করে। উল্লেখ্য এই যে, এই সমস্ত ভুয়া তথ্যের ওপরে নির্ভর করেই প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এরশাদ জাতিসংঘের জনসংখ্যা পুরস্কার লাভ করেন।[৩৩] তাছাড়া বাংলাদেশের গ্রাম ও বস্তি এলাকায় অনুসন্ধান করে অসংখ্য মহিলার খোঁজ পাওয়া যায়, যাঁরা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সহ্য করতে না পেরে জন্মনিয়ন্ত্রণের ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।

সরকারি হিসেব অনুযায়ী সক্ষম দম্পতিদের মধ্যে ৪০ ভাগকে জন্মনিরোধক পদ্ধতি-গ্রহীতা ধরা হয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ড্রপ আউটের হার হলো ৩০ শতাংশ। আর একটি তথ্যও জানা প্রয়োজন। বাংলাদেশে প্রতি বছর সাড়ে এগারো লক্ষ বিয়ে হয়। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগে। আর তাঁদের মাত্র ২০ ভাগ জন্মনিয়ন্ত্রণের সুবিধা লাভ করেন।[৩৮] বাংলাদেশের পুরুষদের মধ্যে এমন একটি ধারণা রয়েছে, পরিবার-পরিকল্পনার বিষয়টি একান্তভাবেই মেয়েদের। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের একটি হিসেব থেকে বাংলাদেশের জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণকারীদের বিষয়ে এই তথ্য পাওয়া যায় : এই সময় পর্যন্ত মোট ৯৪ লক্ষ দম্পতি বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। আই. ইউ. ডি. পদ্ধতি নেন সাড়ে পাঁচ লক্ষ মহিলা, ইনজেকশন আট লক্ষ এবং খাবার ট্যাবলেট ৪৬ লক্ষ ৩০ হাজার মহিলা। বন্ধ্যাকরণ করেন (মহিলা ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) ২১ লক্ষ ৪৫ হাজার জন। কনডম পদ্ধতি ব্যবহার করেন ৯ লক্ষ ১৫ হাজার পুরুষ।[৩৫] উল্লেখ্য এই, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৫,৭৩,১৩,৯২৯ জন পুরুষ, আর ৫, ৪১,৪১,২৫৬ জন মহিলা।[৩৬] দেশের ৫ কোটি ৪১ লক্ষ মহিলার মধ্যে শতকরা ২২ জন শিক্ষিতা বলে সরকার দাবি করলেও বাস্তবে তা ১৬ ভাগের বেশি নয়।[৩৭]

বিভিন্ন তথ্য থেকে স্পষ্ট করেই জানা যায়, বাংলাদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা কখনও অর্জিত হয়নি। বাংলাদেশের সূত্র থেকেই জানা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বছর ২৩ লক্ষ ৫০ হাজার শিশু জন্ম নিচ্ছে। পরিকল্পনা কমিশনের হিসেব মতে এইভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আগামী ২০০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে ১৩ ৭৩ কোটি।[৩৮] বাংলাদেশের মৌলবাদীরা তো দীর্ঘকাল ধরেই জন্মনিয়ন্ত্রণে বাধা দিচ্ছে। তারফলে সেখানে ক্রমশ যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সেখানে যে জন্মবিস্ফোরণ ঘটছে, তা আর আড়াল করে রাখা সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশ

সরকারকে স্বীকার করতে হচ্ছে, 'ভূখণ্ডের নিরিখে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বের জনবহুলতম দেশ।' আবু আহমেদ লিখেছেন, "বাংলাদেশে অনেক আন্দোলনই হয়েছে—কখনও ভাষার জন্য, কখনও গণতন্ত্রের জন্য, কখনও স্বাধীনতার জন্য। কিন্তু কোনও আন্দোলন হয়নি জনসংখ্যার বিপদ সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করার জন্য।"[৩৯]

মানব মুখার্জী সারণি-১৫তে যে তথ্য দিয়ে তাঁর নিজের মতামত ব্যক্ত করেন, তা প্রথমে এখানে উদ্ধৃত করছি।[৪০]

সারণি—১৫

জনসংখ্যার বাৎসরিক গড় বৃদ্ধি (নির্দিষ্ট দশক কালের মধ্যে)

	১৯৫১-১৯৬১	১৯৬১-১৯৭১	১৯৭১-১৯৮১	১৯৮১-১৯৯১
বাংলাদেশ ···	২.৫০	২.৯৫	২.৫৩	২.০১
ভারতবর্ষ ···	২.১৫	২.৪৫	২.৪৭	২.৩৫
পশ্চিমবঙ্গ ···	৩.২৮	২.৬৯	২.৩২	২.৪৬

জনসংখ্যার বাৎসরিক গড় বৃদ্ধি উল্লেখ করে মানব মুখার্জী লেখেন, "এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় হলো, প্রথম ৩টি দশকে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভারতের থেকে বেশি হলেও শেষ দশকে (১৯৮১-৯১) বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের থেকে বেশ কিছুটা কম। যাঁরা মনে করেন, বাংলাদেশ থেকে এদেশে ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তাঁরা এই বিষয়টিকে সবচেয়ে সন্দেহের চোখে দেখছেন—তাঁদের বক্তব্য, ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে গেছে। এক্ষেত্রে তাঁদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো, 'হারিয়ে যাওয়া ১ কোটি'র তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি হলো—১৯৯১-র বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত হবে, এসম্পর্কে যে আন্দাজ করা হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে, সেন্সাসের ফল তার থেকে ১ কোটি কম। অতএব, এই ১ কোটি লোক বাংলাদেশ থেকে 'হারিয়ে' গেছে, অর্থাৎ এদেশে অনুপ্রবেশ করেছে।"[৪১]

মানব মুখার্জী উল্লিখিত পূর্বোক্ত সারণি-১৫ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, গত ৪০ বছরে বিভিন্ন দশকে বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তান সহ) এবং পশ্চিমবঙ্গে বাৎসরিক জনসংখ্যার গড় বৃদ্ধির হার কখনও স্বাভাবিক গতিতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি। ১৯৫১-১৯৬১-র দশকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ব্যাপক হিন্দু উদ্বাস্তু হয়ে প্রধানত পশ্চিমবঙ্গে আসে। তার ফলে ভারতের জাতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির

হারের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। এমন কি পূর্ব পাকিস্তানের চেয়েও বেশি। কারণ ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমান উদ্বাস্তু গমনের হার অনেক কম। ১৯৬১-১৯৭১ দশকে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাংলাদেশের চেয়ে কম হলেও ভারতের জাতীয় হারের চেয়ে বেশি। এই দশকে আইউব খান-বিরোধী ও বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাবে হিন্দু উদ্বাস্তুদের ভারতে (পশ্চিমবঙ্গ সহ) আগমনের হার অনেকটা কম থাকার কারণে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ। ১৯৭১ ১৯৮১ দশকে এসে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম-বঙ্গের হার বাংলাদেশ এবং ভারতের জাতীয় হারের চেয়ে বেশ কম, যদিও বাংলা-দেশের মতো উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস ঘটেনি। কিন্তু ১৯৮১-১৯৯১ দশকে পশ্চিমবঙ্গে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশে ব্যাপক হ্রাস লক্ষ্য করার মতো।

পূর্বেই দেখানো হয়েছে. বিগত দশকগুলিতে জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ কোনও উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে পারেনি। তা সত্ত্বেও গড় বৃদ্ধির যে ব্যাপক হ্রাস ঘটেছে, তার কারণ কি? তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হঠাৎ দুই দশক পরে ঊর্ধগতি হওয়ার কারণই বা কি? অমর্ত্য সেন বলেছেন, "মহিলাদের শিক্ষিত করে তুলতে পারলেই একমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো সম্ভব।" বাংলাদেশে নারীশিক্ষার হার তো পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ (পশ্চিমবঙ্গে ৪৭.১৫%)। সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশে ব্যাপক হ্রাস কি করে সম্ভব? একমাত্র সম্ভব, বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশের মাধ্যমে। তাছাড়া নয়।

মানব মুখার্জী সারণি-১৯ এবং সারণি-২০ যেভাবে উল্লেখ করে তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন, তার মধ্যেও অনেক ফাঁক থেকে গেছে। সারণি ১৯ এ তিনি বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার সম্প্রদায়গত বিন্যাস এবং সারণি-২০-তে ভারতের জনসংখ্যার সম্প্রদায়গত বিন্যাস উল্লেখ করেছেন। এই তথ্যগুলি আমার লেখাতে উল্লেখ করে আমি আলোচনা করেছি। সারণি-১৯-এ মানব মুখার্জী বাংলাদেশের মুসলমান ও হিন্দু জনসংখ্যার সঠিক তথ্য উল্লেখ করেননি। তিনি ১৯৯১ খৃস্টাব্দের সেন্সাস অনুযায়ী মুসলমান ৮৭.৪% এবং সমস্ত সংখ্যালঘুদের সম্মিলিত সংখ্যা ১২.৬% দেখিয়েছেন।[৪২] অথচ প্রকৃত তথ্য হলো, এই সময়ে মুসলমান জনসংখ্যা হবে ৮৮.৩%, আর হিন্দু জনসংখ্যা ১২.১% থেকে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ১০.৫%। এই রচনার অন্যত্র আমি তা উল্লেখ করেছি। কেন তিনি এইভাবে নিজের খুশিমতো সেন্সাসের তথ্য সাজালেন, তা স্পষ্ট নয়।

বাংলাদেশের বৌদ্ধদের বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কোনও আলোচনা না করলেও মানব মুখার্জী লিখেছেন, "১৯৮১ থেকে ১৯৯১-এ বাংলাদেশে বৌদ্ধদের হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, কারণ বৌদ্ধ চাকমারা এই সময় ব্যাপক সংখ্যায় বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতবর্ষের ত্রিপুরায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।"[৪৩] তারপর শ্রী মুখার্জী লিখেছেন, "সারণি-১৯ এবং সারণি-২০ তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষেও হিন্দুদের সংখ্যাগত অনুপাত প্রায় একই শতাংশ পরিমাণে কমেছে। ভারতবর্ষ থেকে হিন্দুদের ব্যাপক দেশত্যাগের কোনও ঘটনা নেই। কাজেই বাংলাদেশে দেশত্যাগের ফলেই অনুপাতে হিন্দুদের সংখ্যা কমেছে—এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। বরং উপমহাদেশের সাধারণ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থায় যে কারণে ভারতবর্ষে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের বৃদ্ধির হার সামান্য বেশি, প্রধানত সেই একই কারণেই বাংলাদেশেও তাই ঘটেছে, এটা ধরে নেওয়াটা স্বাভাবিক।"[৪৪] মানব মুখার্জীর এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, মুসলমানদের জন্মহার হিন্দুদের তুলনায় বেশি। Bangladesh Contraceptive Prevalence Survey, 1991 থেকেও দেখা যাচ্ছে যে, মুসলমানদের TFR (Total Fertility Rate) গড়ে হিন্দুদের চেয়ে ১০% বেশি।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা যে হারে হ্রাস পাচ্ছে, তা কি উক্ত হারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রত্যেকটি আদমসুমারির দিকে তাকালেই মানব মুখার্জীর যুক্তির অসারতা ধরা পড়ে। বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের ভারতে প্রবেশের প্রকৃত কারণকে আড়াল করার যে প্রয়াস তিনি করেছেন, তাতে তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত নিজের বক্তব্যকেই তিনি গুরুত্বহীন করেছেন। তিনি তো নিজেই স্বীকার করেছেন, "একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের খুব স্বস্তিতে থাকার কথা নয়।" আর তিনি এই কথাও লিখেছেন, "বাংলাদেশের রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ অনেক তীব্র চেহারা নিয়েছে।"[৪৫] তাঁর পুস্তিকা থেকে এই ধরনের আরও ত্রুটি উল্লেখ করা যায়। কিন্তু তাতে বর্তমান নিবন্ধটি দীর্ঘ হয়ে যাবে মনে করে তা থেকে বিরত থাকছি।

শ্রী মুখার্জীর গ্রন্থের এইসব দুর্বলতা এখানে প্রকাশ করা হলো তাঁকে সমালোচনা করার উদ্দেশ্যে নয়। অনুপ্রবেশ সমস্যা যে অদূর ভবিষ্যতে বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে পারে, তার সম্বন্ধে তাঁর মতো যুব নেতার আরও সচেতনতা প্রয়োজন। এই কারণেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এইসব লিখতে হলো। আশা করব, বাংলাদেশ ও উত্তর-পূর্ব ভারতের ছবিটি স্পষ্ট করে উপলব্ধি

করার জন্য তিনি প্রয়াসী হবেন। ভারত ও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থেই প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। তা না হলে ধর্মান্ধ মৌল-বাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথটি প্রশস্ত করা সম্ভব হবে না। প্রকৃত তথ্য থেকে সত্যে পৌঁছানোর প্রক্রিয়াটি অগ্রাহ্য করলে বিপর্যস্ত হতে হবে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিকেই। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গত কয়েক বছর ধরে অনুপ্রবেশ সমস্যাকে আমি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি। মানব মুখার্জী তা অনুধাবন করতে পারেননি বলেই এত কথা বলতে হলো।

সূত্র নির্দেশ

১. মানব মুখার্জী : **বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ রাজনীতি এবং বাস্তবতা**। কলিকাতা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪, পৃ: ৩৭

২. অমলেন্দু দে : **বাংলাদেশের জনবিন্যাস ও সংখ্যালঘু সমস্যা**। কলিকাতা, ১৫ আগস্ট, ১৯৯২, পৃ: ২৬, ৪৫-৪৬

৩ **সমন্বয়**, শারদ সংখ্যা, ১৯৯৩, কলিকাতা, পৃ: ৪৪৩

৪. মানব মুখার্জী। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭

৫. **সমন্বয়**, প্রাগুক্ত পৃ: ৪৪৩

৬-৮. মানব মুখার্জী। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭, ৬৭

৯. **সমন্বয়**, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪১

১০, ১১. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৩৮, ৪৪১, ৪৫২

১২. B. K. Roy Burman : **Bangladeshi Issue in Perspective, in Mainstream**, April 24, 1993

১৩. জ্যোতি বসু : **অনুপ্রবেশ সমস্যার প্রকৃত সমাধান প্রয়োজন**। দ্র. **গণশক্তি**, ১১ অক্টোবর, রবিবার, ১৯৯২, পৃষ্ঠা চার। এই প্রবন্ধটি বক্ষমান গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' ক-তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৪. মানব মুখার্জী। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫২-৫৩, সারণি—**১৮ দ্র.**

১৫, ১৬. প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৩

১৭. প্রাগুক্ত। অমলেন্দু দে : **বাংলাদেশের জনবিন্যাস ও সংখ্যালঘু সমস্যা**, পৃ: ২৬। জ্যোতি বসু, প্রাগুক্ত। **সমন্বয়**, পৃ: ৪৪১

১৮. মানব মুখার্জী। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৩-৫৪

১৯ **সমন্বয়**, পৃ: ৪৩৯, ৪৪৯। অমলেন্দু দে : **বাংলাদেশের জনবিন্যাস ও সংখ্যালঘু সমস্যা**। **ভোরের কাগজ**, ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৩, পৃ: ৮। ৪ নভেম্বর ১৯৯৩ একটি অ দেশ ঘোষণা করে বাংলাদেশ সরকার 'শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি' নিলামে বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৩ এই সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বাংলাদেশের যে এগারো জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বিবৃতি দেন, তাঁরা হলেন কবি সুফিয়া কামাল, বিচারপতি কামালউদ্দীন হোসেন, বিচারপতি দেবেশচন্দ্র

ভট্টাচার্য, বিচারপতি কে. এম. সোবহান, অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ, অধ্যাপক আহমদ শরীফ, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, কবি শামসুর রাহমান, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, ফয়েজ আহমেদ ও স্থপতি মাজহারুল ইসলাম। (দ্র. **সংবাদ**, ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৩, পৃ: ১। **ভোরের কাগজ**, ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৩, ঢাকা, পৃ: ৮।) তাঁরা বলেন, "সরকার অর্পিত সম্পত্তি নিলামে বিক্রির যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা উদ্বেগজনক। দেশব্যাপী এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য যখন এই কালো আইন বাতিলের আশা করছে, ঠিক সেসময় এ ধরনের মৌলিক ও মানবাধিকার বিরোধী সিদ্ধান্ত সমস্যাকে আরও ভয়াবহ ও জটিল পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেবে। এই নিলাম বিক্রয়ের মাধ্যমে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণ তাদের ঘরবাড়ি জমিজমা থেকে চিরতরে উচ্ছেদ এবং দেশত্যাগে বাধ্য হবে।" পরিশিষ্ট 'খ' দ্র.।

২০. **সমন্বয়**, পৃ: ৪৫১

২১. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪৩

২২. মানব মুখার্জী। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭

২৩. সমন্বয়, পৃ: ৪৪৫

২৪. মানব মুখার্জী। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫-৪৬

২৫, ২৬. Mohiuddin Ahmad : **The Missing Population**, in Holiday, Dhaka, January 7, 1994. এই প্রবন্ধের জন্য পরিশিষ্ট 'গ' দ্রষ্টব্য।

২৭. **যায় যায় দিন**। বর্ষ ৪, সংখ্যা ৩৯, মঙ্গলবার, ৪ জানুয়ারি, ১৯৯৪, ঢাকা, **বিশেষ সংখ্যা, অস্থিরতার বছর ১৯৯৩**, পৃ: ৫০

২৮. মানব মুখার্জী। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৯

২৯-৩১. **সংবাদ**, ঢাকা, ১০ এপ্রিল, ১৯৯৩

৩২. মানব মুখার্জী। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৯

৩৩-৩৫. **সংবাদ**, ঢাকা, ১১ এপ্রিল, ১৯৯৩

৩৬. **যায় যায় দিন**, প্রাগুক্ত

৩৭. **সংবাদ**, ১১ এপ্রিল, ১৯৯৩

৩৮. শামিম আরা : **পরিবেশ ও জনসংখ্যা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ**, দ্র. **ভোরের কাগজ**, ঢাকা, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪, পৃ: ৪। শামিম আরা লেখেন : "দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণসমূহের মধ্যে

রয়েছে দারিদ্র, অল্প বয়সে বিয়ে, নারীশিক্ষা ও নারীর উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব, শিশু ও নবজাতকের মৃত্যুর উচ্চহার, যা এখনও বাংলাদেশের উচ্চ প্রজননশীলতাকে প্রভাবিত করে যাচ্ছে।"

৩৯ আবু আহমেদ : **জনসংখ্যাবৃদ্ধি আমাদের সব হিসেবকেই গরমিল করে দিচ্ছে**। দ্র. **সংবাদ**, ঢাকা, সোমবার, ৩১মে, ১৯৯৩ : **আনন্দবাজার পত্রিকা**, কলিকাতা, ৫ এপ্রিল, ১৯৯৪। আবু আহমেদ লিখিত প্রবন্ধটি **'পরিশিষ্ট'** ঘ-তে সংযোজন করা হলো।

৪০-৪৫. মানব মুখার্জী। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫-৪৬, ৫৩, ৫৪। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের দুরবস্থা সম্বন্ধে বহু তথ্য বিভিন্ন গ্রন্থে ও পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শাহরিয়ার কবির : **বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার মানচিত্র**, ঢাকা, ১৯৯৩। **বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য : তথ্য ও দলিল**, ঢাকা, ১৯৯৩।

পরিশিষ্ট

॥ ক ॥

অনুপ্রবেশ সমস্যার প্রকৃত সমাধান প্রয়োজন

জ্যোতি বসু

বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের দেশের সীমান্তের বৈশিষ্টই অনুপ্রবেশের সমস্যা সমাধানের অন্যতম বাধা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও সীমান্তের ওপারের বিভিন্ন ঘটনার প্রতিক্রিয়াতেও অনুপ্রবেশ ঘটছে। জাতিগত এবং ভাষাগত মিল থাকার জন্য বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। দিল্লির মতো জায়গায় এদের খুঁজে বের করা যতটা সহজ, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে এই চিহ্নিতকরণ ততটাই শক্ত।

অনুপ্রবেশের বিষয়টি নিয়ে বিগত দশক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা হয়ে আসছে। রাজ্য সরকার এব্যাপারে অনেকগুলি সুপারিশও করেছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বি. এস. এফ.-র মোতায়েন জোরদার করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের সঙ্গে নদী-তীরবর্তী সীমান্ত রয়েছে ৪৫১·৫০ কিলোমিটার। বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্তের সর্বমোট এলাকা হলো, ২২০৩·৪৯ কিলোমিটার। সীমান্তে অনুপ্রবেশ রোধ করা, সীমান্ত সুরক্ষিত করা এবং চোরাকারবার বন্ধ করার কাজে বি. এস. এফ.-রই প্রধান দায়িত্ব। দক্ষিণবঙ্গে বি. এস. এফ.-র মোট ১৭টি ব্যাটেলিয়নের মধ্যে ১১টি ব্যাটেলিয়ন সীমান্তে মোতায়েন রয়েছে, উত্তরবঙ্গে ১৬টি ব্যাটেলিয়নের ৯ ব্যাটেলিয়ন সীমান্তে মোতায়েন রয়েছে। সীমান্তে বি. এস. এফ.র সক্রিয় উপস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

অনুপ্রবেশকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। অনেকে যাঁরা নিয়মমত কাগজ-পত্র নিয়েই এদেশে আসেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁরা স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে মিশে যান বা অন্যত্র চলে যান। এঁদের খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়ে। ভারত সরকারের উচিত বিদেশীদের নথিভুক্ত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিবেচনা করা।

বাংলাদেশের মুক্তির আগে মূলত হিন্দুরাই বাংলাদেশ থেকে ভারতে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে চলে আসত। ১৯৭৯ সাল থেকে মুসলমানরাও ভারতে চলে আসতে

শুরু করেছে। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫২৯ জন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বি. এস. এফ. তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছে। এঁদের মধ্যে ৬৮,৫৭২ জন হিন্দু এবং ১.৬৪,১৩২ জন মুসলমান। একই সঙ্গে মোবাইল টাস্ক ফোর্স-সহ রাজ্য পুলিশ ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯২ সালের মে মাসের মধ্যে ২,১৬,৯৮৫ জন অনুপ্রবেশকারীকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এঁদের মধ্যে ৫৬,৩৫২ জন হিন্দু এবং ১,৬৯,৭৯৫ জন মুসলমান। অর্থাৎ বি. এস. এফ. এবং রাজ্য সরকারের বাহিনীগুলি অনুপ্রবেশ রোধ করার কাজে ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু যাঁরা বি. এস. এফ-র জাল কেটে দেশে ঢুকে পড়ছেন, তাঁদের আটকানোর জন্য মোবাইল টাস্ক ফোর্সকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। ভারত সরকারকে এব্যাপারে আমরা ১৯৮৫ সাল থেকে চাপ দিচ্ছি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রস্তাবে এখনও রাজি হয়নি। এই সমস্যার জটিলতা উপলব্ধি করে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পাঠানো প্রস্তাব অনুসারে মোবাইল টাস্ক ফোর্সকে শক্তিশালী করা।

১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ৩৩ লক্ষ ১৫ হাজার বাংলাদেশী তাঁদের নিয়মমাফিক বৈধ কাগজপত্র নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন। এঁদের মধ্যে ২৭ লক্ষ ২৭ হাজার মানুষ প্রকৃতপক্ষে ভারত ত্যাগ করেছেন। ফলে এর থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, প্রায় ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার বাংলাদেশী তাঁদের ভিসার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও ভারতে বসবাস করছেন। তাই ভিসা ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক এবং নথিভুক্ত করার পদ্ধতি চালু করা, যাতে এই সমস্যাকে কার্যকরীভাবে রোধ করা যায়।

সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশ বন্ধ করার এই হলো সঠিক সময়। এরজন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তাহলো, ভিসা আইনকে কড়া করা, ভিসা নিয়ন্ত্রণে কম্পিউটার ব্যবস্থা চালু করা, বিদেশী আইন অনুসারে নথিভুক্ত করা। এগুলি প্রয়োগ করা গেলে অনুপ্রবেশ বন্ধ করা কার্যকরীভাবে সম্ভবপর হয় এর পাশাপাশি সীমান্তে বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের রুখতে হলে সীমান্তে বি. এস. এফ.-র মোতায়েন আরও বৃদ্ধি করা উচিত। ইতিমধ্যেই সীমান্তবর্তী রাস্তা নির্মাণ এবং সীমান্তে কাঁটা তার দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এই দুটি কর্মসূচিই অত্যন্ত জরুরী। তাই নির্দিষ্ট সময়মতো এই প্রকল্পের কাজ শেষ করার জন্য রাজ্য সরকার সমস্ত রকম সহযোগিতা করবে। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো, ভারতের মধ্যে যে কোনও ধরনের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। এরই পাশাপাশি টহলদারি

বাহিনীকে শক্তিশালী করতে হবে, যাতে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা যায়। আমরা এই বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনাতেও বসতে পারি।

১৯৭১ সাল থেকে যাঁরা ভারতে এসেছেন, তাঁদের সংখ্যা প্রথমে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই সংখ্যাটি জানতে পারলে সমস্যাটির গভীরতা বুঝতে পারা অনেক সহজ হবে।

এর ভিত্তিতে ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি আলোচনা করলে এইসব মানুষের মর্যাদা নির্ধারণ এবং পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করা যাবে। এঁদের বাংলাদেশে 'পুশ ব্যাক' করা বা ফিরিয়ে দেওয়ার মানবিক দিকের কথাও মনে রাখতে হবে।

এপ্রসঙ্গে আরেকটি সমস্যার কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৮৩ সালে আসাম সরকার ১২ হাজার বাস্তুহারাকে পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং তাঁদের জলপাইগুড়ি জেলায় শিবির করে রাখা হয়। এবিষয়টি আমরা আসাম সরকার এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা করি; কিন্তু কোনও প্রয়োজনীয় সাড়া পাইনি। এখনও তাঁদের অনেকেই উদ্বাস্তু শিবিরে বাস করছেন। আবার ১৯৮৬ সালে আসামের উত্তর লখিমপুর থেকে ৩৬টি পরিবারের ২০১ জন পশ্চিমবঙ্গে আসেন। আমি এই বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলি কিন্তু এখনও পর্যন্ত এব্যাপারে কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। দার্জিলিঙ আন্দোলন চলার সময়ে কিছু নেপালীকে শিলং থেকে পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই ব্যাপারটিও কেন্দ্রীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করি। ১৯৮৯ সালে ৪৯৪টি মৎসজীবী পরিবারের বাংলাদেশী ২১২৯ জনকে ওড়িশা থেকে পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এইসব মানুষজন হুগলী জেলায় আশ্রয় নেয়। এই সমস্যাটির কথাও কেন্দ্রের কাছে তোলা সত্ত্বেও এখনও কোনও সমাধান হয়নি। যদি কোনও রাজ্য সরকার বেআইনী অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করে, তাহলে তাঁদের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়ে দিলেই চলবে না। এই ব্যবস্থাটি অনুপ্রবেশ সমস্যার সমাধান হতে পারে না।*

* এই নিবন্ধটি 'গণশক্তি', রবিবার, ১১ই অক্টোবর, ১৯৯২, ২৫শে আশ্বিন, ১৩৯৯, চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

॥ খ ॥

পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে অর্পিত সম্পত্তি আইন

মোঃ ফজলুল রহমান

[লেখক সদর সহকারী জজ, জেলা—যশোহর।]

১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইন (The Special Powers Act, 1974 এবং ১৯৯২ সনের সন্ত্রাস বিরোধী আইন (Anti Terrorism Act, 1992)-কে যদি তর্কের খাতিরে নিপীড়নমূলক আইন হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে ১৯৬৫ সনে জারিকৃত শত্রুসম্পত্তি তথা (পরবর্তীকালের) অর্পিত সম্পত্তি আইনটিও নিঃসন্দেহে একটি কালো আইন। তদুপরি প্রথমোক্ত আইন দু'টি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য এবং প্রয়োগযোগ্য হলেও অর্পিত সম্পত্তি আইনটি প্রবর্তনের সময় থেকেই তা শুধুমাত্র একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের তথা হিন্দুসম্প্রদায়ের ওপরে খড়্গ কৃপাণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সচেতন ব্যক্তিমাত্রই অবগত রয়েছেন যে, বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইন—সময়ের তাগিদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত হয়েছে। পক্ষান্তরে সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনাকে প্রাধান্য দিয়ে নিতান্তই বিদ্বেষপ্রসূতভাবে 'শত্রু সম্পত্তি' আইন প্রণয়ন করেছেন তৎকালীন পাকিস্তান সরকার।

বিগত ১৯১৪ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জার্মান মিশনের সম্পত্তি তত্ত্বাবধান এবং সংরক্ষণ-কল্পে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রণীত ১৯১৬ সনের The Enemy Mission Act, The Enemy Trading Act এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে একই উদ্দেশ্যে জারিকৃত Defence of India Act ও তদ্‌অধীনে প্রণীত Defence of India Rules-এর ধারণা থেকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার শত্রু সম্পত্তি আইনের ধারণা গ্রহণ করেছেন বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, গত ১৯৬৫ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর তৎকালীন পাকিস্তানের সহিত ভারতের যুদ্ধ শুরু হয়। ঐ যুদ্ধ মাত্র ১৭ দিন স্থায়ী হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার দিনই পাকিস্তানের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি পাকিস্তান ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ১৯৬২ সনের সংবিধানের ১ ও ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ক্ষমতা

অনুযায়ী সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দেশবাসীর মৌলিক অধিকার খর্ব হয়ে যায়। ঐ সময়ে তিনি পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ, ১৯৬৫ [Defence of Pakistan Ordinance (Ordinance No. 23, 1965)] জারি করেন এবং উক্ত অধ্যাদেশের ক্ষমতাবলে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধি, ১৯৬৫ (Defence of Pakistan Rules, 1965) ঘোষণা করেন। এই প্রতিরক্ষা বিধির ১৬১ নং বিধানে 'শত্রু' এবং ১৬৯ নং বিধানে 'শত্রু সম্পত্তির' সংজ্ঞা দেয়া হয়।

'শত্রু' বলতে কোনও গোষ্ঠী বা সার্বভৌম রাষ্ট্র যিনি বা যারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ বা আঁতাত করেছে বা ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত রয়েছে অথবা 'শত্রু' দেশে বসবাস বা নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে, তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। একই সঙ্গে 'শত্রু সম্পত্তি' বলতে উপরোক্ত শত্রুদের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি বা শত্রুকবলিত, মালিকানাধীন বা ব্যবস্থাপনায় ছিল কিংবা আছে, তাই বুঝাবে।

উপরোক্ত প্রতিরক্ষা বিধিরই ১৮২ নং বিধান মোতাবেক সমগ্র পাকিস্তানের জন্য একজন Custodian, প্রাদেশিক সরকারের অধীনে একজন করে Deputy Custodian এবং প্রতিটি জেলার জন্য একজন করে Assistant Custodian নিয়োগের কথা বলা হয়েছে।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, উপরোল্লিখিত অধ্যাদেশ এবং বিধির আলোকে উক্ত অধ্যাদেশ কিংবা বিধানাবলীর অন্যান্য শর্ত পালন কিংবা পূরণ না করেই অগণিত হিন্দুদের সম্পত্তি রাতারাতি 'শত্রু সম্পত্তি' হিসেবে গণ্য হয়ে যায়। এক্ষেত্রে অত্যন্ত সজাগ এবং সচেতনভাবেই আইনের প্রতি অবজ্ঞা এবং অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। কোনও সম্পত্তি 'শত্রু সম্পত্তি' হিসেবে ঘোষণা কিংবা তালিকাভুক্ত করার পূর্বে উক্ত সম্পত্তি ভোগদখলকারীর ওপরে বাধ্যতামূলকভাবে নোটিশ জারির বিধান রয়েছে। এপ্রসঙ্গে The Law of Vested Properties in Bangladesh—Sree Mridul Kanti Rakshit (Second Edition)-এর ৫১ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: "So without notice under paragraph 5 of E.P. (Lands and Buildings) Administration and Disposal Order, 1965 cannot be declared the property as enemy property [28 DLR 437 HCD]."

একই প্রসঙ্গে 28 DLR (1976)-এর ৪৩৭ নং পৃষ্ঠায় [Naresh Chandra Nandi Vs The Deputy Commissioner, Dacca & others] দেখা যায়:

"Before an enemy property is declared to be in unlawful possession of a person the latter must be served with notice to the effect that he is in unlawful possession of the property in question and ask him to show cause why he should not be ejected and upon hearing him, if he appears, the order of ejecting him is to be passed. Without such notice the order passed against him not be a valid order."

নোটিশ জারির ব্যাপারে বাধ্যতামূলক বিধান থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনও প্রকার নোটিশ জারি না করেই 'শত্রু সম্পত্তি' হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এহেন প্রবণতা অব্যাহত থাকাবস্থায় গত ১৯৬৯ সনে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ এবং প্রতিরক্ষা বিধিসমূহ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও শত্রু সম্পত্তি জরুরী বিধান অবিরতি অধ্যাদেশ [The Enemy Property Continuance of Emergency-Provision Ordinance, 1969 (Ordinance No. I of 1969)] নামে এক নতুন অধ্যাদেশ জারি করা হয়।

উপরোক্ত নতুন অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইতিপূর্বে জারিকৃত পাকিস্তান প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ এবং পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধিসমূহ প্রত্যাহার করা সত্ত্বেও 'শত্রু সম্পত্তি' সম্পর্কিত বিধি-বিধানসমূহ বহাল এবং বলবৎ রাখা হয়। পূর্বোক্ত অধ্যাদেশ এবং বিধির আলোকে যে সকল ফার্ম কিংবা সম্পত্তির দখল তৎকালীন সরকার কিংবা শত্রু সম্পত্তি কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছিলেন, তার একটি আইনগত ভিত্তি সাময়িকভাবে অব্যাহত রাখাই উক্ত অধ্যাদেশ জারির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বলে সহজেই অনুমান করা যায়। ফলে নতুন অধ্যাদেশের কারণে হিন্দুসম্প্রদায়ের হয়রানি এবং নিগ্রহ পূর্ববৎ অব্যাহত থেকে যায়।

পরবর্তীকালে এদেশে স্বাধীনতার আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা বিপুল উৎসাহে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পাকিস্তানের চিরশত্রু ভারত বাঙালীর মুক্তিসংগ্রামে সর্বান্তকরণে এবং সর্বাত্মকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে। অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট, চরম আত্মত্যাগ এবং এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাঙালী স্বাধীনতা লাভ করে। তাই পাকিস্তানের ইন্তেকাল তথা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে অর্পিত সম্পত্তি আইনটির কার্যকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে বলে কিংবা উক্ত আইনটি

সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হবে বলে সবাই ধারণা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এপ্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

১৯৭১ সালে রক্তস্নাত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তৎকালীন মুজিবনগর সরকার Proclamation of Independence and Laws Continuance Enforcement Order, 1971 জারি করেন। উক্ত ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনার পরিপন্থী কোনও আইন বাংলাদেশে বহাল কিংবা কার্যকর থাকবে না বলে সুদৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। তাই উপরোক্ত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত ঘোষণার দিন থেকেই পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত অর্পিত সম্পত্তি আইনটি তার কার্যকারিতা হারানোর কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। উপরন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকার গত ২৬.৩.৭২ তারিখে বাংলাদেশে সম্পত্তি ও পরিসম্পদ ন্যস্তকরণ আদেশ [Bangladesh Vesting of Property and Assets Order (29), 1972] জারি করেন। এই আদেশে পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে সাবেক শত্রু সম্পত্তিও সরকারি ব্যবস্থাধীনে ন্যস্ত হয়। উক্ত আদেশে বলা হয়, "Article 2(1). All properties which during the Government of Pakistan vested in that Government have from 26.3.71 vested in the Government of Bangladesh [27 DLR (AD) (1975), P-52]।" উপরোক্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য সরকারি সম্পত্তির সঙ্গে পাকিস্তান আমলে ঘোষিত শত্রু সম্পত্তি সমূহও বাংলাদেশ সরকারের ওপরে অর্পিত হয়। ফলে গত ১৯৬৯ সালের ১ নং আদেশটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশেও যথারীতি বহাল এবং বলবৎ থেকে যায়।

আজ পর্যন্ত ১২টি সংশোধনী সত্ত্বেও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয়ভাগে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিধানাবলী সন্নিবেশিত রয়েছে। উক্ত তৃতীয় ভাগেরই ২৬ নং আর্টিকেলে 'মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন বাতিল', ২৭ নং আর্টিকেলে 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' এবং ২৮ নং আর্টিকেলে 'ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য প্রদর্শন না করা' সংক্রান্ত বিধানাবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে।

উপরোল্লিখিত বক্তব্য সম্বলিত আর্টিকেলসমূহ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত থাকাবস্থায় এবং উক্ত সংবিধান বহাল তবিয়তে কার্যকর থাকাবস্থায় সংবিধানের পরিপন্থী অর্পিত সম্পত্তি আইন কিভাবে কার্যকর থাকে কিংবা থাকতে পারে, তার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

১৯৭৪ সালে তৎকালীন সরকার অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কে দু'টি আইন প্রবর্তন করেন। আইন দু'টি হচ্ছে—শত্রু সম্পত্তি অবিরত জরুরী বিধান (প্রত্যাহার) আইন [The Enemy Property (Continuance of Emergency Provision (Repeal) Act] তথা Act XLV of 1974 এবং ন্যস্ত ও অনিবাসী সম্পত্তি (পরিচালনা) আইন [The vested and Non-Resident Property (Administration) Act] তথা Act XLV of 1974 বাতিল তথা প্রত্যাহার সংক্রান্ত আইনটি প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন সরকারের সদিচ্ছার অভাবে কিংবা ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে বাস্তবায়িত হয়নি কিংবা কার্যকর হয়নি। কিন্তু Act XLVI of 1974 বুনিয়াদে এই সমস্ত শত্রু সম্পত্তি সরকারের ওপরে ন্যস্ত হয় এবং ঐ সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে পরিচিত না হয়ে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। একই সঙ্গে এই আইন গত ২৩.৪.৭৪ তারিখ হতে অতীত কার্যক্ষমতা (Retrospective effect) সহ সংসদীয় আইনে পরিণত হয়। এই আইনের সূত্র ধরে পরবর্তী সরকাবসমূহের আমলে যে সমস্ত আইন প্রবর্তন করা হয়, তা এদেশের হিন্দুসম্প্রদায়ের জন্য শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি করে। যার অভিশাপ আজও পুরোপুরি নিঃশেষিত হয়নি।

উপরোল্লিখিত Act XLVI of 1974 পরবর্তীকালেও কিছু কিছু বিষয়ে জটিলতার সৃষ্টি করে। ফলে ২৭.১১.৭৬ ইং তারিখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি অর্পিত ও অনিবাসী সম্পত্তি (প্রশাসন) (প্রত্যাহার) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ [The Vested and Non-Resident Property (Adiministration) (Repeal) Ordinance, 1976 (Ordinance No. 92 of 1976) জারি করেন। উক্ত অধ্যাদেশের মাধ্যমে Act XLVI of 1974 প্রত্যাহার করা হয়। একই সঙ্গে উক্ত ২৭.১১.৭৬ তারিখেই শত্রু সম্পত্তি জরুরী বিধান অবিরতি (প্রত্যাহার) (সংশোধন) [The Enemy Property Continuance Emergency Provision (Repeal) (Amendment) (Ordinance No. 93 of 1976)] জারির মাধ্যমে Act XLV of 1974 সংশোধন করা হয়। উক্ত আইনের মাধ্যমে সরকার অর্পিত ও অনিবাসী সম্পত্তির একচ্ছত্র প্রশাসক এবং নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত হন। এহেন অবস্থায় সরকার ঐ সম্পত্তির হস্তান্তরসহ অন্য যে কোনভাবে ব্যবস্থাপনার ক্ষমতাসহ প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ব্যাপক ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ফলে ১৯৭৬ সালের ৯৩ নং অধ্যাদেশটি প্রকারান্তরে গত ২৩.৪.৭৪ ইং তারিখ থেকেই অবিরতি অবস্থায় কার্যকর থেকে যায়।

উপরোক্ত ৯৩ নং অধ্যাদেশটি জারি করার পরে ভূমি-প্রশাসন এবং ভূমি-সংস্কার মন্ত্রণালয় গত ২৩.৫.৭৭ তারিখে বিজ্ঞপ্তি নম্বর-১/ক-১/৭৭/১/৫৬ আর. এল. সম্বলিত একটি নোটিশ জারি করেন। উক্ত নোটিশের মাধ্যমে শত্রু সম্পত্তি প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বক্তব্য সন্নিবেশিত করা হয়। উক্ত নোটিশের ৩৭ এবং ৩৮ নং অনুচ্ছেদে নিজ নিজ এলাকার বিনা তালিকাভুক্ত সম্পত্তি (Concealed Vested Property) খুঁজে বের করার জন্যে এডিসি (রাজস্ব) পর্যায়ের অফিসার থেকে শুরু করে তহশিলদার পর্যন্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে পুরস্কৃত করার কথা ঘোষণা করা হয়। ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে অবৈধ প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হিন্দু মালিকানাধীন সম্পত্তি তো বটেই, অনেক মুসলমানের সম্পত্তিও অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়ে যায়। তবে হিন্দু জনসাধারণের হয়রানি, দুর্ভোগ এবং দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে। এহেন অবস্থায় সংশ্লিষ্ট অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আইনের প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা, অবহেলা এবং অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

কোনও সম্পত্তিতে কোনও ব্যক্তি যে কোনভাবেই দখলে রাখলে তাকে উচ্ছেদ না করার ব্যাপারে আইনে উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে The Vested Properties in Bangaladesh (2nd Edition)—Mridul Kanti Rakshit-এর ৫২নং পৃষ্ঠায় দেখা যায় :

"Person in possession of enemy property on the basis of imperfect nature can not be ousted by the Custodian (20 DLR 995 ; 30 DLR 139)."

একই বইয়ের ১১০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে :

"Co-sharer in exclusive possession of joint land, his possession is not unlawful and he cannot be ousted from the property [30 DLR (sc) 139]. Custodian cannot dispossess the real owner from the land. His remedy is to seek partition so as to separate the enemy property from the owner's portion [30 DLR (Sc) 139 ; IBCR (1981) (AD) 109].

নিতান্তই অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পুরস্কার-লাভের আশায় উপরোক্ত আইনগুলি দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা পর্যন্ত সচেতনভাবে পদদলিত করেছেন বলে অগণিত প্রমাণ রয়েছে।

and even not so as non-resident vested property upto November, 1978. This attempt of the Government to treat a property as a vested one after 13 years from the date of the Indo-Pakistan War and after 7 years from the independence of Bangladesh must be treated as grossly malafide."

কিন্তু ১৯৭৮ সনের বহু পরেও ভিপি হিসেবে তালিকাভুক্ত করে নেয়ায় বহু মোকদ্দমা এখনো বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এরকম ভিপি সংক্রান্ত মোকদ্দমাসমূহের ব্যাপারে সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হয়।

কোনও দেবোত্তর সম্পত্তির কতক সেবাইত অথবা সকল সেবাইত ভারতে চলে গেলেও শুধুমাত্র একারণেই নিরঙ্কুশ দেবোত্তর সম্পত্তি শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি হিসেবে ঘোষিত হতে পারে না। এপ্রসঙ্গে 24 DLR (1976)-এর ৫৫ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে :

"Absolute property of a Deity cannot be declared as enemy property, only because some or all shebaits have migrated to India."

কিন্তু উপরোক্ত বিধি-বিধানের প্রতিও সম্মানে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করা হয়েছে বলে অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোনও সম্পত্তিতে ভিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দখল নেয়ার পূর্বে উক্ত-সম্পত্তি অন্য কাউকে লীজ বা বন্দোবস্ত না দেয়ার বিধান রয়েছে। এপ্রসঙ্গে 28 DLR (1976)-এর ৪৩৭ নং পৃষ্ঠায় দেখা যায় :

"Before settlement of the enemy property, the Custodian is to take possession of the property from the person who is admittedly in possession. Unless the possession is taken from the person in possession, the Custodian will have no power to settle land to any person."

একই প্রসঙ্গে 31 DLR (1979)-এর ৩৫৯ নং পৃষ্ঠায় (Hiralal Agarwala Vs Deputy Commissioner Bogra & others) উল্লেখ রয়েছে :

"Custodian of the Enemy Property treating a property as being a vested property without lawful basis for treating it as

such and leasing out the same to another is unauthorised and illegal."

কিন্তু আইনে যা-ই থাকুক না কেন, বাস্তবে যা দেখা যায়, তা হলো যে, ভিপি কর্তৃপক্ষ ভিপি ঘোষিত সম্পত্তিতে দখল নেয়ার প্রয়োজনীয়তা বেশির ভাগ সময়েই অনুধাবন করেন না। দখল না নেওয়া সত্ত্বেও উক্ত জমি তাঁরা লীজে প্রদান করেন। লীজ-গ্রহীতাও লীজপ্রাপ্ত সম্পত্তিতে বিপুল উৎসাহে সদলবলে দখল গ্রহণ করেন। আর বিচারের বাণী তখন নীরবে নিভৃতে নয়, বরং প্রকাশ্য দিবালোকে এবং জনসমক্ষেই কেঁদে মরে।

অর্পিত সম্পত্তির কোনও পূর্বতন মালিক কিংবা দখলকার উক্ত সম্পত্তি বাবদ লীজের প্রার্থনা করলেও তার স্বকার্যজনিত কারণে ভিপি সংক্রান্ত কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জ করার ব্যাপারে তিনি বারিত নন। এপ্রসঙ্গে 3BCR (1983)-এর ২২৫ নং পৃষ্ঠায় বিধৃত রয়েছে :

"Mere prayer for lease of the property from the Deputy Custodian of Enemy Property does not stop a person from challenging the enemy character of the suit property."

উপরোক্ত আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নজির বাস্তবে অত্যন্ত বিরল।

সুতরাং অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রবর্তনের সময় থেকেই এই আইনের অপব্যবহার এবং অপপ্রয়োগ কি কি ভাবে হয়েছে কিংবা এখনও হচ্ছে, উপরোল্লিখিত ঘটনাবলী এবং রেফারেন্সগুলির আলোকে তা অনস্বীকার্য ভাবেই প্রমাণিত হয়। এরকম আরও অসংখ্য রুলিং এবং রেফারেন্সের উল্লেখ করা যায়। আইনের নামে এহেন হয়রানি, নিগ্রহ এবং নির্যাতনের অসহায় শিকার হয়ে সংখ্যালঘু পরিবারের অনেকেই নীরবে চোখের জল ফেলেছেন কিংবা এখনও ফেলে চলেছেন। আবার কেউ বা সবকিছু হারিয়ে দেশত্যাগ করেছেন। যা সত্যি হৃদয়বিদারক।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অর্পিত সম্পত্তি আইনটি প্রবর্তনের সময় থেকেই এই আইন প্রত্যাহারের দাবিতে এদেশের সচেতন হিন্দুসমাজ বিচ্ছিন্নভাবে দাবি এবং প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন। অনেক চড়াই-উৎরাইয়ের পরে গত ১৯৮০ সনে তাঁদের এই প্রতিবাদ সংগঠিত আকার ধারণ করে। দেশের প্রায় সব ক'টি শহরে এবং রাজধানী ঢাকায় এই আইন বাতিলের দাবিতে "অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ পরিষদ" গঠিত হয়। অত্যন্ত সীমিত পরিসরে এই সংগঠন তাঁদের কার্যক্রম আজও অব্যাহত রেখেছেন।

১৯৮২ সনে জেনারেল এরশাদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাঁর আমলে ভূমি-প্রশাসন ও ভূমি-সংস্কার মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গত ১৯৮২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে একটি সার্কুলার জারি করা হয়। উক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে অর্পিত সম্পত্তি বেচাকেনার অধিকার সরকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু অর্পিত সম্পত্তি বিক্রয় কিংবা হস্তান্তরের ব্যাপারে 36 DLR (1984)-এর ২৫৩ নং পৃষ্ঠায় দেখা যায় :

"All the enemy property vested in the Custodian shall be exempted from attachment, seizure or sale in execution of a Civil Court's decree or orders of any other authority."

একই প্রসঙ্গে 5 BLD (1985)-এর ৯২ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে :

"Enemy or vested property cannot be sold in auction and the execution case should be stayed as long as the property remains vested property."

অর্পিত সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় না বলে উপরোক্ত রেফারেন্স দুটিতে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। তাই বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারের সার্কুলারটি যে সঠিক কিংবা আইনানুগ ছিল না, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং বিক্রি সংক্রান্ত সার্কুলারটি জারির পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুসম্প্রদায়ের জন্যে কি ধরনের আতংকের সৃষ্টি হয়, তা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন নয়। এহেন অবস্থায় উপরোল্লিখিত 'প্রতিরোধ পরিষদ' আবারও নতুন করে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

এমতাবস্থায় ২১.৬.৮৪ ইং তারিখ হতে আর কোনও সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হবে না বলে তৎকালীন রাষ্ট্রপতির বরাত দিয়ে ভূমি-প্রশাসন এবং ভূমি-সংস্কার মন্ত্রণালয় থেকে পরবর্তীকালে বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হয়। এছাড়া তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ৩১.৭.৮৪ তারিখে ঢাকার শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মহাসম্মেলনে এই মর্মে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট ঘোষণাও প্রদান করেন। এরপর গত ১৯৮৯ সনের ১৮ই জুলাই অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকেও রাষ্ট্রপতি মহোদয় তাঁর উপরোক্ত ঘোষণা পুনর্ব্যক্ত করেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসততা এবং অসাধুতার কারণে রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের উপরোক্ত ঘোষণাসমূহও যে পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি, তার অগণিত প্রমাণ রয়েছে।

সত্য বলতে কি অর্পিত সম্পত্তি আইনটি প্রবর্তনের পর থেকেই এই আইনের বিভিন্ন ফাঁক-ফোকর কাজে লাগিয়ে সরকারি প্রশাসন থেকে শুরু করে গ্রামেগঞ্জে শহরে-বন্দরে অগণিত টাউটের সৃষ্টি হয়েছে, যারা সময় এবং সুযোগ বুঝে বিভিন্ন

অজুহাতে নিজেদের আখের গুছাতে প্রতিনিয়ত সচেষ্ট থেকেছে এবং এখনও রয়েছে। এরই পাশাপাশি প্রতিটি সরকারেরই রাজনৈতিক সদিচ্ছা কিংবা সুস্পষ্ট অঙ্গীকারের অভাবে এই আইনের অসহায় শিকার হচ্ছেন ভাগ্যবিড়ম্বিত অসহায় নরনারী। অর্পিত সম্পত্তি আইনের আওতায় তহসিলদার থেকে শুরু করে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা পর্যন্ত অবিচার-অনাচার এবং স্বেচ্ছাচারের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন, 31 DLR (1979)-এর ৩৪৩ নং পৃষ্ঠায় (Bakul Rani Sen Gupta and another Vs Bangladesh and others) তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। উক্ত রায়ের সূত্র ধরে অনুসন্ধান চালালে এহেন স্বেচ্ছাচারের অগণিত প্রমাণ সংগ্রহ করা মোটেও কঠিন নয়।

এমতাবস্থায় উপরোল্লিখিত সমুদয় ঘটনাবলীর আলোকে এবং সামগ্রিক বিবেচনায় তথা অর্পিত সম্পত্তি আইন জারি হওয়ার ফলে এবং উক্ত আইন অদ্যাবধি বহাল এবং কার্যকর থাকার কারণে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুসম্প্রদায়ের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট, ভোগান্তি, হয়রানি, নিরাপত্তাহীনতা এবং ক্ষয়ক্ষতির কথা সহৃদয়তার সহিত অনুধাবন করে এর প্রতিবিধানে যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা সরকার এহেন অবস্থায় বিভিন্ন পট পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন বাস্তবতার আলোকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ক্ষমতাসীন সরকার নতুনভাবে ভেবে দেখতে পারেন যে,

১। বিগত ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের শত্রু ভারত এখনও বাংলাদেশের শত্রু কিনা ?

২। ১৯৬৫ সালে মাত্র ১৭ দিন স্থায়ী পাক-ভারত যুদ্ধের পটভূমিতে জরুরী অবস্থাকালীন সময়ে জারিকৃত আইনটি উক্ত সময়ের ২৮ বছর পরেও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্য আজও অত্যাবশ্যক কিংবা অপরিহার্য কিনা ?

৩। ভারতের সহিত বাংলাদেশের ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রীচুক্তি বিদ্যমান থাকাবস্থায় সার্ক মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এবং সাপ্টা চুক্তি বাস্তবায়নের সুদৃঢ় অঙ্গীকারকে সামনে রেখে অর্পিত সম্পত্তি আইন বহাল কিংবা কার্যকর রাখা ন্যায়সঙ্গত কিংবা যুক্তিসঙ্গত অথবা আইনসঙ্গত কিনা ?

৪। অর্পিত সম্পত্তি আইন মৌলিক এবং মানবিক অধিকারের সহিত সঙ্গতি-পূর্ণ কিংবা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তথা উক্ত আইন বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী কিনা ?

গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মানবিক মূল্যবোধ, রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার এবং ন্যায়-

বিচারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে উপরোল্লিখিত ইস্যুগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করে বর্তমান সময়ের সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং পারিপার্শ্বিকতার আলোকে জনকল্যাণকামী সরকার বাহাদুর অর্পিত সম্পত্তি আইন সম্পূর্ণভাবে বাতিলের ব্যাপারে তাঁদের অবস্থান আবারও ভেবে দেখতে পারেন।*

* 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকা। ঢাকা। ১৭.৫.৯৩ এবং ১৮.৫.৯৩ তারিখে এই নিবন্ধটি উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত।

॥ গ ॥

The Missing Population

Mohiuddin Ahmad

Main findings of the 1991 population census of Bangladesh have been released formally by the *Bangladesh Bureau of Statistics* (BBS). The data, in combination with data of the previous census reports show a declining trend in the *Hindu* population of the country. Consequently the *Muslim* population is increasing in proportion.

The first census of independent Bangladesh registered the proportion of *Hindus* to be 13.5% of the total population. This proportion dropped down to 12.1% in 1981 and 10.5% in 1991. While the proportion of the *Buddhists* and the *Christians* remained stable, 0.6% and 0·3% of the total Population respectively in successive census years, the proportion of the *Muslim* population, however, increased from 85.4% in 1974 to 88.3% in 1991.
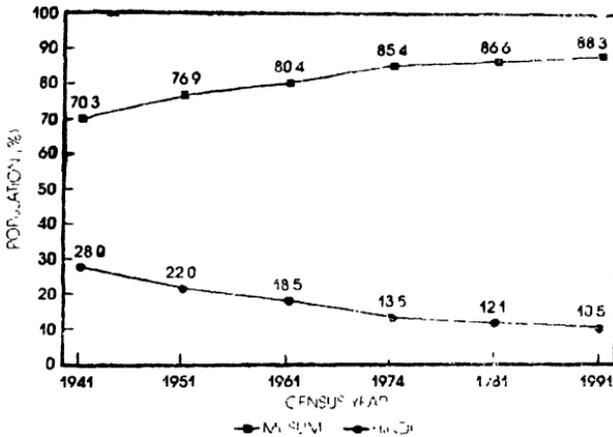
How to interpret this phenomenon ? Population cannot wither away. In demographic terms, the situation has to be addressed using relevant parameters of fertility, mortality,

growth rate and migration. The situation may be analyzed with the help of simple statistics. We shall use official data for obvious reason.

It has been found that the *total fertility rate* (TFR) among the *non-Muslims* is relatively lower than the *Muslims*, *the* difference ranged from 7% to 12% in the eighties. It has never been claimed that the *Hindus* have higher mortality rate. It is likely that they have lower mortality rate due to higher extent of immunisation among their children (ref. Bangladesh Contraceptive Prevalence Survey, 1991).

A 10% lower fertility rate for the *Hindu* population would be a safe proposition. Taking into consideration of the extent of lower fertility and assuming uniform mortality rates, the size of the *Hindu* population based on "natural growth" can be estimated. Based on adjusted census data of 1974, the *Hindu* population was estimated to be 10.31 million. During the 1974-81 period, the *Muslim* population registered an annual growth of 2.56%. A 10% lower fertility rate for the *Hindu* community would correspond to an annual growh rate of 2.30% during this poriod, and the population should have been 12.10 million in 1981. But the actual *Hindu* population in 1981 was 10.88 million which corresponded to an annual growth rate of only 0.77% during the 1974-81 period. Such a low growth rate is comparable to several European countries, and even lower than the United States, Canada and Japan where the growth rate was 1% or more in the seventies.

The developments in the eighties are also similar. The annual exponential growth rate of population in Bangladesh during the inter-censal period from 1981 to 1991 was 2.17%. While the Muslim population registered an annual growth of 2.37% during this period from 1981 to 1991, the correspon-ding rate for the *Hindu* population was only 0.73%. Based on fertility estimates, such growth rate for the *Hindu* population should have been around 2.13% and the consequent population in 1991 should have been 13.44 million. Based on the 1991 population data of the BBS, the actual *Hindu* population is estimated to be 11.70 million.

Thus we encounter a scenario of "missing *Hindu* population" in the successive census periods. The extent of this missing population was about 1.22 million during the period of 1974-81 and about 1.73 million during the last inter-censal period 1981-91. As many as 475 *Hindus* are "disappearing" everyday from the soil of Bangladesh on an average since 1974. How this phenomenon would be interpreted in terms of demography ? The relevant parameter is obviously "migration" which provides a clue to the missing link.

It would be interesting to look into demographic patterns and changes among the ethnic minorities of Bangladesh. Such analyses are seriously constrained by lack of adequate and reliable data. The aggregate population of the ethnic minority nationalities, termed as "tribal" in the BBS literature, has been reported to be slightly more than 1.2 million, which registered a relatively higher growth to the extent of 3% annually during 1981-91. Among the ethnic minorities in Bangladesh, the *Chakmas* are the largest group with a population of 252,986. A similar exercise based on limited data available from the BBS shows that about 33,000 *Chakmas* "disappeared" from the Chittagong Hill Tracts alone during the ten year period from 1981 to 1991. Consequently the proportion of the *Chakmas* among the total "tribal" population of the country dropped from 24% in 1981 to 21% in 1991, It would be possible to analyse the situation of other groups when detailed census data are available for use.*

* The essay was published in the HOLIDAY, 7th January, 1994, Dhaka.

॥ ঘ ॥

জনসংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের সব হিসেবকেই গরমিল করে দিচ্ছে

আবু আহমেদ

[ম্যালথাস বাংলাদেশকে দেখেননি, কিংবা এধরনের একটি অবস্থার কথা চিন্তাও করেননি। কিন্তু আজকে বাংলাদেশ-সহ অন্য কয়েকটি দেশের জনসংখ্যা-জনিত চিত্র দেখলে মনে হয়, ম্যালথাস যেটা বলেছেন, সে তো কম বলেছেন ; এখন জীবিত থাকলে এই তত্ত্বকে আরও জোর দিয়ে তিনি বলতেন, শুধু খাদ্য উৎপাদনই জনসংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে পড়বে না, শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনও পিছিয়ে পড়বে। আমরা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছি ?]

বাংলাদেশের লোকসংখ্যা কত ? সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এই সংখ্যা ১২২ মিলিয়নের কিছু ওপরে—কোটিতে ১২·২ কোটি। আমাদের দেশটির আয়তন কত ? প্রায় ৫৬,৫০০ বর্গমাইলের মতো। দেশে শিক্ষিতের হার কত ? ৩৫%। দেশটি বছরে কত জাতীয় আয় উৎপাদন করে ? সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী ২৬,০০০ মিলিয়ন ডলারের মতো অর্থাৎ মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ২২০ ডলার। রফতানি আয় ১·৯ মিলিয়ন ডলার, বিপরীতে আমদানি ব্যয় হচ্ছে প্রায় দ্বিগুণ। বিদেশী ঋণের পরিমাণ হলো—যা বর্তমানে বাংলাদেশের দেয়—১৫ বিলিয়ন ডলার। এদেশের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার হলো ২·৭%। প্রতি হাজারে মৃত্যুর হার হলো ১০৮, আর প্রায় ৭ হাজার লোকের জন্য রয়েছে একজন করে চিকিৎসক।

ওপরের পরিসংখ্যানগুলি এশিয়া উইকের একটি সাম্প্রতিক সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। এশিয়া উইক শুধু বাংলাদেশের জন্য এধরনের পরিসংখ্যান উল্লেখ করেনি, অন্যান্য দেশের জন্যও করেছে, যাতে করে তুলনামূলক একটি চিত্র পাওয়া যায়। লোকসংখ্যাজনিত পরিসংখ্যানগুলির আলোকে যে ৪৪টি দেশের পরিসংখ্যান এশিয়া উইক উল্লেখ করেছে, তাতে বাংলাদেশের স্থান নিম্ন থেকে চতুর্থ। আর জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, বৈদেশিক ঋণ এবং আমদানি-রফতানি বিষয়ক পরিসংখ্যানগুলির আলোকে আমাদের স্থান নিম্ন থেকে ৬ষ্ঠ। আমরা এক্ষেত্রে মঙ্গোলিয়া, আফগানিস্তান, নেপাল, কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনামের

ওপরে। তবে ভিয়েতনামের অবস্থা আজ আর আমাদের থেকে খারাপ নয়, একদিন খারাপ থাকলেও তারা আজকে আমাদেরকে ছুঁয়ে গেছে। জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে সম্পর্কিত আন্তঃদেশীয় বিভিন্ন পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে তুলনা করা মুশকিল, তবে যেকোনও বিচারেই আমরা যে পিছিয়ে আছি, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এঅঞ্চলে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থানে আছে শ্রীলংকা। দেশটিতে রাজনৈতিক সংকট না থাকলে সামাজিক উন্নয়নে এবং মাথাপিছু আয় উপার্জনে এদেশটি দরিদ্র দেশগুলির জন্য মডেল হতে পারত। পাকিস্তান, ভারত বড় পথে এগুচ্ছে, বড় বড় বিনিয়োগ আর প্রজেক্টের পেছনে আছে তারা। তবুও যেন সুবিধা করতে পারছে না। বিদেশী পুঁজি আসি আসি করেও ব্যাপকভাবে আসতে চাচ্ছে না। না আসার পেছনে অবিশ্বাস এবং অস্থিরতাই দায়ী।

পুঁজির কোনও দেশীয় সীমানা নেই। যেখানেই পুঁজি নিরাপত্তা এবং আয় পাবে, সেখানেই প্রবাহিত হবে। ছোট অর্থনীতি হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থা আরও নাজুক। এখানে নামমাত্র বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে, তাও দেশটি যখন আমদানির ক্ষেত্রে কঠোর বাধানিষেধের নিয়ম অনুসরণ করছিল। তখন দেশীয় বাজারের প্রতি কিছু বিদেশী কোম্পানীর মোহ ছিল। আজকে আমদানি উদার করার সাথে সাথে তারা ভবিষ্যৎ লাভালাভের ব্যাপারে শংকিত হচ্ছে। কয়েকটি কোম্পানী ইতিমধ্যে তাদের স্থাপনা বিক্রয় করে দিয়েছে, অন্য কয়েকটিও ব্যবসা গুটানোর চিন্তা করছে। তবে বাংলাদেশকে এই চলে যাওয়াকে স্বাভাবিক ধরতে হবে। প্রতিযোগিতাকে ভয় করে কেউ যদি চলে যেতে চায়, তাকে যেতে দেয়া হোক। আমাদের অর্থনীতির সম্ভাবনা থাকলে এক কোম্পানী চলে গেলে আর দু'কোম্পানী এসে হাজির হবে। যাক, আজকে আমাদের এপ্রবন্ধ লেখার মূল উদ্দেশ্য এসব বলা নয়, মূল উদ্দেশ্য হলো, আমাদের বর্ধিত লোকসংখ্যার আপদ সম্বন্ধে কিছু বলা।

সবাই জানে, টমাস ম্যালথাস দুনিয়াবাসীকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন অধিক জনসংখ্যার বিপদ সম্বন্ধে। টমাস ম্যালথাস বলেছিলেন, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধির দরুন খাদ্য উৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের পেছনে পড়ে থাকবে। বর্ধিত জনসংখ্যা দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করবে। ফলে সচেতনভাবে জনসংখ্যা কমিয়ে না রাখলে প্রাকৃতিকভাবে এসংখ্যা কমতে বাধ্য। তবে মানবজীবন যেভাবে থাকার কথা ঐভাবে নয়, না খেয়ে, না ঘুমিয়ে অনেকটা অমানবিকভাবে মৃত্যুর বাগে যাবার প্রক্রিয়ায় কিছুদিনের অবস্থান হবে মাত্র। ম্যালথাসের এই তত্ত্বের অনেক সমালোচনা হয়েছে, এমনকি ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতি-

বিদদের একটি অংশও এই তত্ত্বকে মেনে লোকসংখ্যাকে সীমিত করার পক্ষে মত দেয়নি। এমনকি আজও এই তত্ত্বের পক্ষে স্বীকৃত কোনও মনোভাব গড়ে ওঠেনি। তবুও প্রত্যেক সচেতন লোকই বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা সমস্যার প্রশ্নে আসলে টমাস ম্যালথাসের কথাই চিন্তা করেন। অনেকে ভাবেন, কী সত্য কথাটাই না তিনি কত আগে বলে গেছেন। ইংল্যাণ্ডের জন্য হয়তো এই তত্ত্ব আজও সত্য নয়। কিন্তু বাংলাদেশের মতো একটি দেশে কি এই তত্ত্ব ফলার বাকি আছে?

ম্যালথাস বাংলাদেশকে দেখেননি, কিংবা এধরনের একটি অবস্থার কথা চিন্তাও করেননি। কিন্তু আজকে বাংলাদেশ-সহ অন্য কয়েকটি দেশের জনসংখ্যাজনিত চিত্র দেখলে মনে হয়, ম্যালথাস যেটা বলেছেন, সে তো কম বলেছেন। এখন জীবিত থাকলে এই তত্ত্বকে আরও জোর দিয়ে বলতেন শুধু খাদ্য উৎপাদনই জনসংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে পড়বে না, শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনও পিছিয়ে পড়বে আমরা কোথায় গিয়ে পেঁাছেছি? আমাদের জনসংখ্যা পাকিস্তান আমলের প্রথমদিকের সাড়ে ৩ কোটি থেকে বেড়ে আজকে সোয়া ১২ কোটিতে পেঁাছেছে। মাত্র ৪০ বছরের মধ্যে লোকসংখ্যা বেড়েছে সাড়ে ৩ গুণ বাড়েনি দেশের আয়তন। যে জমিটুকু আমরা স্বাধীন দেশের আওতায় পেয়েছি, তাও খুবই দ্রুততার সঙ্গে শেষ হয়ে যাচ্ছে কৃষি-কাজে ব্যবহারের হাত থেকে। চারদিকে বসতবাড়িগুলি যেভাবে চাষযোগ্য জমিতে ওঠা আরম্ভ করেছে, তাতে আর বেশিদিন লাগবে না, যখন আমরা আমাদের জীবন-যাত্রায় ভারসাম্য পুরো হারিয়ে ফেলব। আজকে যেখানে বলা হচ্ছে, আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি কিংবা করতে যাচ্ছি, এভাবে বসতবাড়ি তৈরির মাধ্যমে জমি হারালে এ লক্ষ্য অর্জনও সম্ভব হবে না। আমাদেরকে সামনে বিরাট খাদ্য-ঘাটতি মোকাবেলা করতে হবে, যা একমাত্র বাইরে থেকে আমদানি করেই মেটানো সম্ভব। আমাদের জনসংখ্যা বর্তমানের হারে বাড়ছে কেন? এর উত্তর অনেক এবং অনেক পুরনোও। ঐসব কারণ উল্লেখ করে লেখা ভারি করার কোনও মানেই হয় না। শুধু একথা বলব, সচেতনতার অভাব। এই সচেতনতা অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে লেশমাত্র নেই, শিক্ষিত অনেক লোকের মধ্যেও নেই। শিক্ষিত অনেক লোককে দেখা যায়, যাঁরা তাঁদের জীবনটা সনাতন পদ্ধতিতে প্রবাহিত করে দিতেই অভ্যস্ত। ছেলেমেয়ে বেড়েই চলেছে, কিভাবে চলবে, কোথায় পড়াবে তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। যখন বলা হয়, তখন এঁরা কুতর্কও করেন। বলে বসেন, এটা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু একজনের ব্যক্তিগত বিষয় বা অধিকার পুরো সমাজের জন্য বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে। আমাদের সমাজে আজকে যে ভারসাম্যহীনতা এবং অস্থিরতা বিরাজ করছে, লোকসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি কি তার অন্যতম কারণ নয়?

তারপরেও কিভাবে বলা যায়, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হতে দেয়াটা ব্যক্তিগত অধিকার বা বিষয়। আজকে রেল স্টেশনে, স্টিমার ঘাটে অগণিত লোক যে শুয়ে আছে, এরা কি সমাজের অন্য লোকদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করছে না? অথচ আমরা লোকসংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটা সমানে অনুশীলন করে চলেছি।

অর্থনীতির প্রাথমিক নিয়ম মেনেই এখানে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটছে। মেয়েরা অশিক্ষিত হয়ে ঘরে বসে আছে। সন্তানধারণে তার এখনই কোনও আর্থিক ক্ষতি নেই। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে ভাবনাহীন, চেতনাহীন কিছু পুরুষ। মেয়েদের চেয়েও তারা অধিক দায়িত্বহীন। তাদের পক্ষে মানব-প্রজননে সহায়তা করা যত সহজ, অন্য কিছু করা তত সহজ নয়। অশিক্ষা, বেকারত্ব এসবই লোক-সংখ্যার বোঝার জন্য দায়ী। কিন্তু এগুলিকে আমরা রাতারাতি তাড়াতে পারব না। তাই বলে কি আমরা বর্ধিত লোকসংখ্যার অভিশাপ থেকেও নিস্তার পাব না? পাব না বলেই ভাবি, আর সেজন্যই ফুটে ওঠে চোখের সামনে একটা ভুখা, ক্লান্ত বাংলাদেশ, যেখানে অগণিত লোক বেকার আর তারা না খেয়ে থাকবে, যেখানে পাশাপাশি থাকবে কিছু ধনী লোক, যারা কোনরকমে হয়তো বেঁচে যাবে। তবে এত হতাশার চিত্র তুলে ধরতে চাই না। নিয়মশৃংখলা মেনে চললে অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে আলো দেখা যেতে পারে, আমরা ক্রমাগত বেশি লোককে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করে সমাজটাকে সুন্দর এবং সচেতন করে তুলতে পারি।

বাংলাদেশে অনেক আন্দোলনই হয়েছে—কখনও ভাষার জন্য, কখনও গণতন্ত্রের জন্য, কখনও স্বাধীনতার জন্য। কিন্তু কোনও আন্দোলন হয়নি জনসংখ্যার বিপদ সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করার জন্য। কিছু এন.জি.ও. কোটি কোটি টাকা খরচ করছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে কমিয়ে আনার জন্য, কিন্তু তেমন কাজ হচ্ছে না। বাঙালিরা পরস্পর কলহ-দ্বন্দ্বে যত সময় নষ্ট করছে, তার সিকিভাগও যদি লোকসংখ্যা বৃদ্ধির বিপদ সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যয় করত, তাহলে অনেক কাজ হতো। এই জাতি যেন এক আত্মহননের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এই প্রতিযোগিতা থেকে ফিরে এই জাতিকে সুস্থ হতে হবে, সামনের দিকে চাইতে হবে, অন্যরা কি করছে, তা দেখতে হবে। আমাদের জীবনধারণের পদ্ধতিতেই যেন আমাদের জন্য গরীবত্ব নিহিত রয়েছে। যা কিছু আমার ভাল, তা নিয়ে আমার গর্ব করার আছে, কিন্তু জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আমাদের বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা করতে হবে। অন্ধকার, কুসংস্কার নিয়ে আমরা উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারবো না। পৃথিবী এখন অনেক ছোট হয়ে গেছে, মানুষের নজরের কাছে। কোথায় কি হচ্ছে, এসবই আমাদেরকে জানতে হবে। অলসতা এবং না

প্রতিজ্ঞা আমাদেরকে জয় করে ফেলবে, যা অন্য জাতি দেখতে আসবে না। লোকসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তর করতে পারলে ভাল, না হলে ওরা বোঝা হয়েই সমাজে থাকবে। লোকসংখ্যা বোঝা হয়ে থাকা মানে অন্য যারা কর্ম করছে, তাদের আয় থেকে হিস্যা নেয়া। এভাবে আমরা দু'কোটি কর্মজীবী লোক ১২ কোটি মানুষকে খাইয়ে চলেছি এবং এই প্রক্রিয়াকে বন্ধ করতে না পারলে দুনিয়া এগিয়ে যাবে, আর আমরা পিছনেই পড়ে থাকবো অনাগত কালতক *

* এই নিবন্ধটি ঢাকার 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত। সোমবার, ৩১মে, ১৯৯৩।